ফেব্রুয়ারি ২০১৪, মাঘ-ফাল্গুন ১৪২০

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেনের সাক্ষাৎকার

সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বত্রই এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

– মোঃ নূর করিম
প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনগুলো পর্বের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক মোঃ নূর করিম। তিনি ১৯৬৭ সালে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে সহকারী পরিসংখ্যান কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেছিলেন। ৩৩ বছরের কর্মজীবন শেষে ২০০০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন এই কর্মকর্তা তাঁর কিছু কথা বলেছেন আমাদের প্রতিবেদকের সাথে।

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদানের সময়কার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমার যোগদানের সময় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় পশ্চিম পাকিস্তানে হওয়ায় চাকরি পাওয়ার পর আমরা যারা পূর্ব পাকিস্তানের ছিলাম তাদের যোগদান করতে সামান্য সময় লাগে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের চাকরিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা আগে যোগদান করায় ব্যাংক নীতিমালা লঙ্ঘন করে আমাদের আগে তাদের জ্যেষ্ঠতা প্রদান করা হয়। নিয়মবহির্ভূত এ আচরণের ফলে আমরা বাঙালিরা জ্যেষ্ঠতা ফেরত প্রদানের আবেদন জানাই। শেষ পর্যন্ত বহু চেষ্টার পর আমরা জ্যেষ্ঠতা ফেরত পাই।

১৯৭১ সালের পর স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগদানের অনুভূতি কেমন ছিল ?

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পরিসংখ্যান বিভাগে আমি কর্মরত ছিলাম। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত প্রাদেশিক কার্যালয়ে সে সময় পরিসংখ্যান বিভাগ না থাকায় যোগদানের ক্ষেত্রে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত তৎকালীন Personnel বিভাগে যোগদান করি।

কর্মরত অবস্থার কিছু স্মৃতি বলুন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ঢাকাস্থ 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের' প্রাদেশিক কার্যালয়কে দিয়ে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়েই কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। যোগদানের পরই প্রথমবারের মতো দেশের Balance of Payment এর বিবরণী প্রস্তুত করার দায়িত্ব লাভ করি। এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্টের ভাউচার থেকে প্রাথমিকভাবে কাজটি শুরু করলাম। স্বাধীন দেশে প্রথমবারের মতো নতুন কিছু তৈরি করার আনন্দই ছিল অন্যরকম।

প্রাক্তন নির্বাহী পরিচালক মোঃ নূর করিম

বাংলাদেশ ব্যাংকে ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো স্থাপন প্রক্রিয়ার সাথে আপনি যুক্ত ছিলেন- এ বিষয়ে কিছু বলুন।

১৯৯২ সাল। তখন আমি ডিজিএম। বিশ্বব্যাংকের শর্ত ছিল সিআইবি স্থাপনের। তারপর মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে সিআইবি স্থাপন করার কাজ শুরু করলাম। অনলাইন সিআইবি স্থাপনের জন্য সবক্ষেত্রে আমি তৎকালীন ডেপুটি গভর্নর শাহ আব্দুল হান্নানের পূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। সর্বপ্রথম আমরা একটি শিডিউল প্রস্তুত করি সেখানে Credit ও Finance দুটি ফর্ম ছিল। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়। সার্বিকভাবে সকলের মতামতের ওপর ভিত্তি করে সে সময় Matrix আকারে সিআইবির রিপোর্টিং ফরমেট প্রস্তুত করা হয়।

কর্মময় জীবনের পর অবসর সময় কিভাবে কাটছে ?

অবসর গ্রহণের পর আমি এবি ব্যাংক ও ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকে কাজ করেছি। বর্তমানে পূর্ণ অবসর জীবন কাটাচ্ছি। মূলত বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেই আমার সময় কেটে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে আমি দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তানের জনক।

বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন পরিবর্তন/কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ব্যাংকে কম্পিউটার ছিল না। পরবর্তীতে জনতা, অগ্রণী ব্যাংকে কম্পিউটার আসে। সেখানে গিয়ে মাঝে মাঝে কাজ করতে হতো। আর এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রত্যেক কর্মকর্তার সামনে ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ রয়েছে। আমাদের সময়ে যেখানে সিআইবি রিপোর্টের জন্য ব্যাংকগুলোকে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে থাকতে হতো, এখন সেখানে অনলাইন সিস্টেম চালু হয়েছে। ব্যাংকগুলো এখন সরাসরি ডাটাবেজ থেকে সিআইবি রিপোর্ট নিতে পারে। সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বত্রই এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার পক্ষ হতে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা, গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিআইবিএম'র মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী

নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠিত

ব্যাংকিং সেবায় নৈতিকতা বিষয়ে নুরুল মতিন স্মারক বক্তৃতা ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ স্মারক বক্তৃতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান।

অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সনৎ কুমার সাহা বলেন, ব্যাংকের অর্থায়ন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করেছে। বিশেষ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতের জন্য নেয়া বিভিন্ন ব্যবস্থা ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। একই সাথে এসব খাতের কাঠামোগত দুর্বলতা আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বিঘ্নিত করতে পারে বলে সতর্ক করেন তিনি। সনৎ কুমার সাহা ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে অধিকারবঞ্চিত মানুষের সুযোগ ও সৃষ্টিশীলতার সম্ভাবনা বাড়ানোর প্রয়াসের ওপর জোর দেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, কৃষি ও এসএমই খাতের অর্থায়নের কার্যক্রমসহ ব্যাংকিং খাতের অর্থায়ন সুবিধাগুলো প্রভাবশালী মহলসমূহের দ্বারা বা অর্থায়ন মঞ্জুরি ও বিতরণে সংশ্লিষ্টদের দ্বারা অনৈতিকভাবে অপব্যবহৃত হওয়া প্রতিরোধে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া অর্থায়ন কার্যক্রমে বিচ্যুতির প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। গভর্নর আরও বলেন, ব্যাংকগুলোর ঋণ সম্পদের গুণগতমান বিচার এবং বিরূপ মূল্যায়িত ঋণ-সম্পদের বিপরীতে চলতি আয় থেকে সংস্থান দ্বারা মূলধন ভিত্তি অটুট রাখার মাপকাঠিগুলো আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম মানের পর্যায়ে ক্রমশ উন্নীত করা হচ্ছে; যাতে অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকাশমান আর্থিক খাতের সঙ্গতি ও সামর্থ্য সুস্থ বিকাশের ধারায় থাকে।

উল্লেখ্য, স্বাধীন বাংলাদেশের শুরুর বছরগুলোয় দেশের ব্যাংকিং খাতের নতুন কাঠামো রূপায়ণে নুরুল মতিনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্মরণে বিআইবিএম প্রতিবছরই এই বক্তৃতার আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে বিআইবিএমের মহাপরিচালক তৌফিক আহমেদ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের বিভিন্ন পর্যায়ের সাবেক ও বর্তমান উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চলতি বছর প্রায় ৮৯ হাজার কোটি টাকার এসএমই ঋণ বিতরণ হবে

চলতি বছরে (২০১৪) ক্ষুদ্র ও মাঝারি (এসএমই) খাতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৮৮ হাজার ৭৫৩ কোটি টাকা। যা গত বছরের তুলনায় ১৪ হাজার ৫৬৬ কোটি বা ১৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ ১৫ জানুয়ারি ২০১৪ সব তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী বলেন, এসএমই খাতের প্রসার ও জনপ্রিয়তার কারণেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে। এছাড়া লক্ষ্যমাত্রা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেরাই দিয়েছে। কাউকে চাপিয়ে দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, ঋণ বিতরণ ও আদায় বৃদ্ধিতে তিন স্তরে মনিটরিং পরিচালিত হয়ে আসছে। এবার মনিটরিং আরও বাড়ানো হবে। অন্যদিকে সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ঋণ পুনঃতফসিল করার যে সুযোগ দেয়া হয়েছে সেটির যাতে সদ্ব্যবহার হয় সেদিকে নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও তিনি জানান।

সভায় জানানো হয়, সদ্যসমাপ্ত ২০১৩ সালে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭৪ হাজার ১৮৭ কোটি টাকা। সেই হিসেবে চলতি বছর ১৪ হাজার ৫৬৬ কোটি টাকার বেশি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সভায় আরও জানানো হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এসএমই ঋণ নীতিমালা অনুসরণ করে এই খাতে ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে নিবিড় পর্যবেক্ষণ করা হবে। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন এলাকার সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার চিহ্নিত করে এর উন্নয়নে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বগুড়া অফিস

আঞ্চলিক টাস্কফোর্স এর সভা অনুষ্ঠিত

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের দ্বিমাসিক (৬৯তম) সভা ৯ অক্টোবর ২০১৩ বাংলাদেশ ব্যাংকে বগুড়া অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়ার মহাব্যবস্থাপক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মনোজ কান্তি বৈরাগী, উপ পরিচালক খালেদা দিলরুবা প্রমুখ। সভায় বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও বগুড়া অফিসের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত সভায় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ সম্পর্কে সকল অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়ে সভাপতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

আঞ্চলিক টাস্কফোর্সের সভায় মহাব্যবস্থাপক ও অন্যান্য কর্মকর্তা

খুলনা অফিস

মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনার আয়োজনে ১৬ ডিসেম্বর ২০১৩ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে অফিস প্রাঙ্গণে মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এইচআরডি-১ এর উপ মহাব্যবস্থাপক ওসমান গণি মোল্লা। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক কমান্ড, খুলনার আহ্বায়ক এস, এম, কবিরুল ইসলাম (যুগ্ম পরিচালক) এবং সদস্য সচিব এম, ওয়াহিদুজ্জামান (যুগ্ম ব্যবস্থাপক)। এছাড়া খুলনা অফিসের মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অফিসের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চে মহাব্যবস্থাপকের সাথে মুক্তিযোদ্ধা কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিস

বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ এবং খুলনা অফিসের যৌথ আয়োজনে ১১ নভেম্বর ২০১৩ খুলনা অফিসের সভাকক্ষে Online Agent Information Management System শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ এর ১৮এ ধারায় অন-লাইনে আবেদন পত্র ও অন্য দলিলাদি উপস্থাপন বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক শ্যামল কুমার দাস। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক নুরুন নাহার। সভায় সভাপতিত্ব করেন খুলনা অফিসের বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক নির্মল কুমার সরকার। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ তফসিলি ব্যাংকের ৩৫জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

বরিশাল অফিস

বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগ (এফইআইডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের উদ্যোগে ও বাংলাদেশ ব্যাংক, বরিশাল অফিসের আয়োজনে বরিশালে ২৫ নভেম্বর ২০১৩ এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন ১৯৪৭ এর ১৮এ ধারায় অন-লাইনে আবেদনপত্র ও অন্য দলিলাদি উপস্থাপন বিষয়ে এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এফইআইডি'র মহাব্যবস্থাপক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার এবং সভাপতিত্ব করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফইআইডি'র উপ মহাব্যবস্থাপক নুরুন নাহার। কর্মসূচিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পাঁচজন কর্মকর্তাসহ তফসিলি ব্যাংকের ২১জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ভাষাসৈনিকদের মধ্যে আলাউদ-দীন হোসেন অন্যতম। তিনি একাধিকবার গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামসহ বহু আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, পেয়েছেন স্বীকৃতি ও সম্মাননা। আলাউদ-দীন হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকের যুগ্ম পরিচালক ইস্তেকমাল হোসেনের পিতা। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিবারের এই ভাষাসৈনিকের জন্য আমরা গর্ববোধ করি। পরিক্রমার পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনে তাঁর অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে **ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেনের** *সাক্ষাৎকারটি প্রকাশ করা হলো।*

ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেন

ভাষা আন্দোলনে আপনি কিভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করলেন?

বিষয়টা আকস্মিক। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জিন্নাহ্ সাহেব যখন উচ্চারণ করলেন, 'Urdu and Urdu alone shall be and must be state language of Pakistan' তখনই একটা No ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছিল। আমি ততটা না বুঝলেও, No না বললেও একটা শিহরণ অনুভব করি আর আমার পাশে বসা ভদ্রলোকের সাথে তৃতীয়বারে আমি No No বলে উঠি। জমায়েত শেষ হলে লোকজন যখন সভাস্থল ত্যাগ করছিল তখন জিন্নাহ্ সাহেবের বক্তব্যকে প্রায় সকলেই কঠোর ভাষায় সমালোচনা করছিল। আর তখনই আমার মধ্যে একটি রাজনৈতিক চেতনা অংকুরিত হয়।

ভাষা আন্দোলনে আপনার সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২, সময় সন্ধ্যা ৬টা। থানা কো-অপারেটিভ অফিসার ট্রেনে ঢাকা থেকে গাজীপুর এসে আমাদের কাছে দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যা বললেন তা ছিল অত্যন্ত হৃদয় বিদারক। আমরা তৎক্ষণাৎ মিছিল নিয়ে লর্ড রোনালশে রোড ধরে অফিস পাড়া, বাজার ও রেলস্টেশন ঘুরে থানা কো-অপারেটিভ মাঠে জনসভা করলাম।

২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টা। একই স্থানে জনসভার সিদ্ধান্ত নিয়ে রাত ১০টায় আমরা ক'জন পরামর্শ সভায় বসলাম। অসময়ে জনসভা হলেও নয়টার মধ্যে প্রায় বিনা প্রচারে ব্যাংকের ছোট্ট মাঠটি কানায় কানায় ভরে যায়। বাধ্য হয়ে সভার স্থান ব্যাংক সংলগ্ন হাইস্কুল মাঠে স্থানান্তর করা হয়। ভেবে আশ্চর্য হই যে তখনকার দিনে তুলনামূলকভাবে দেশপ্রেমিকের সংখ্যা যেন একটু বেশিই ছিল।

জনসভা রেখে সকলের ইচ্ছানুযায়ী আমি ঢাকা রওনা হই। ঢাকায় জিল্লু ভাইয়ের সাথে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়। তিনিই প্রয়াত মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান। তাঁর কাছেই আমার ছাত্র রাজনীতির দীক্ষা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোক। তাঁর কাছে আমি ২১ পরবর্তী ঘটনাগুলো শুনি। জিল্লুভাই কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন এবং আমাদের পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন।

আমরা কিছু পত্র ও নির্দেশনা এবং রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদের বেশকিছু ব্যাজ, প্রচারপত্র বিলি করেছি আর অন্যদের দিয়েছি। এসময় অনেকে আমাদের অর্থ সাহায্য করতো।

প্রচারপত্রগুলো আরিখোলা, ঘোড়াশাল, ভৈরব, নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও আখাউড়া এসব এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছি। ফলে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী মফস্বল থেকে গ্রাম এলাকা পর্যন্ত স্কুল-কলেজ, বাজার ও বন্দর ধর্মঘট পালিত হয়েছে। আবার ঐসব কাজের ফাঁকে সুযোগ পেলেই বিভিন্ন সভায় যোগ দিতাম। এসব কাজে যারা আমার সাথে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছে তাদের মধ্যে আমার সহপাঠী নাছির ভূঞা, প্রয়াত মহিউদ্দিন বাদশার নাম মনে আছে। প্রচারপত্র বিলি আর ছোটখাটো পথসভায় বক্তৃতা দেওয়ার মধ্যেই আমাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কোথাও হয়তো দাঁড়ালাম, দু'একজনের কথা বলার ফাঁকে লোক জমায়েত হয়ে যেত। ভাষাকর্মী হিসেবে আমাদের সবাই সমীহ করত।

আপনার ছাত্রজীবন ও পরিবারের পটভূমি সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন-

আমার বাবা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত আলেম। তিনি মাদ্রাসা বোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন শিক্ষক। আমরা তিন ভাইবোন। আমার ছোট ভাই ইঞ্জিনিয়ার আর সবচেয়ে ছোট বোন মিশনারি স্কুলের মেধাবী ছাত্রী ছিল। একজন মাওলানার ছেলে-মেয়েদের মাদ্রাসার পরিবর্তে ইংরেজি স্কুলে দেয়াতে বাবাকে অনেকসময় প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয়েছে। অর্থনৈতিক অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিলনা কিন্তু মা'র দক্ষ পরিচালনায় আমাদের কখনো কষ্ট করতে হয়নি।

আমার স্ত্রী রওসনারা হোসেন ছিলেন বিদূষী এবং রূপবতী। গাজীপুরে তিনি বড়আপা নামে পরিচিত ছিলেন। গাজীপুর মহিলা পরিষদের সভাপতি ছিলেন শুরু থেকে আমৃত্যু। জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সেক্রেটারি ছিলেন

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ভাষাসৈনিকদের এক সংবর্ধনা প্রদান করে। ছবিতে (সামনের সারির ডানদিক থেকে তৃতীয়) ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেন

নিবন্ধ

অর্থনৈতিক সঙ্কট ও সম্ভাবনা

মোঃ বায়েজীদ সরকার

২০১১ সালে দেশের মূলধন বাজারে সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা মূলধন বিনিয়োগকারীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি আস্থার সংকট সৃষ্টি করে। ঘটনাটির একটি সম্পূরক প্রভাব এসে পড়ে দেশের সামগ্রিক ঋণপ্রবাহে। ঋণপ্রবাহে কিছুটা মন্থরতা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে সংঘটিত ব্যাংকিং খাতের আরও কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা *[Hall Mark Scam, 2012 and Bismillah Scam 2012]* ঋণপ্রবাহের চলমান মন্থরতাকে আরও প্রলম্বিত করে। বাংলাদেশের মতো একটি উদীয়মান উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে *[emerging developing economy]* ক্রমবর্ধমান ঋণ চাহিদার বিপরীতে ক্রমহ্রাসমান ঋণ প্রবাহ দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। ইতোমধ্যেই ব্যাংকগুলোর আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য নির্দেশকসমূহে এর নিম্নমান লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাথে ২০১৩ সালের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা বা অনিশ্চয়তা যোগ হয়ে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত এসব ধারাবাহিক ঘটনাবলীর প্রভাব সামগ্রিকভাবে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

এসব ঘটে যাওয়া ও ঘটতে থাকা ঘটনাবলী থেকে যে কেউ এসবের ক্ষতিকর প্রভাবগুলো সহজেই অনুধাবন করতে পারেন। তবে এর ফলে দেশের অর্থনীতির ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি ও সম্ভাবনা অনুমানের জন্য সামষ্টিক অর্থনীতির কিছু মৌলিক নির্দেশক *[indicator]* বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সাধারণত উন্নত অর্থনীতিতে কাম্য প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে প্রধানতম সীমাবদ্ধতাসমূহের মধ্যে একটি হলো তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়ন তথা সামগ্রিকভাবে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দ্বারা অর্থনীতিতে কোনো অর্থপূর্ণ চাহিদা *[significant demand]* সৃষ্টি হয় না। অপর সীমাবদ্ধতাটি হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিম্ন বা কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণাত্মক হার যা অর্থনীতিতে সম্ভাবনাত্মক চাহিদা *[potential demand]* সৃষ্টির সুযোগকে একেবারেই সংকুচিত করে ফেলে। এ কারণে কিছুটা বাধ্য হয়েই কোন কোন উন্নত দেশ অভিবাসন প্রক্রিয়া চালু রাখে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ইউরোপিয় দেশসমূহ এসবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আবার জাপান অনুরূপ সীমাবদ্ধতা মোকাবেলা করলেও এখনও পর্যন্ত দেশটি কার্যকর কোন অভিবাসন প্রক্রিয়া চালু করেনি। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে উন্নত অর্থনীতিতে উদ্বৃত্ত তহবিলের তুলনায় ঋণ চাহিদা কম হয় ফলে সুদের হারও কম থাকে। বিকল্প হিসেবে উন্নত দেশগুলো ঋণ পরিশোধে সক্ষম উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ঋণ প্রদানের জন্য উৎসাহী থাকে। এ কারণে উন্নত দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশ একটি সম্ভাবনাত্মক ঋণ গ্রহণকারী দেশ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অপরদিকে বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উদ্ভূত অর্থপূর্ণ চাহিদা, অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ চাহিদা এবং বাড়তি জনসংখ্যা উদ্ভূত সম্ভাবনাত্মক চাহিদা দেশটির সামষ্টিক অর্থনীতিতে কার্যকরভাবে বাড়তি চাহিদা সৃষ্টি করে আসছে। মূলত এসব কারণেই বাংলাদেশের মতো উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশে বাড়তি ঋণপ্রবাহের চাহিদা সৃষ্টি হয় যার ফলে ঋণ মূল্য বা সুদহার তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তবে সুদহার বেশি হলেও বিষয়গুলো দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে।

> *বাংলাদেশের মতো উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশে বাড়তি ঋণপ্রবাহের চাহিদা সৃষ্টি হয় যার ফলে ঋণ মূল্য বা সুদহার তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। তবে সুদহার বেশি হলেও বিষয়গুলো দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধিতে অর্থপূর্ণ অবদান রাখে*

উল্লিখিত মৌলিক অর্থনৈতিক কারণ বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, বিদ্যমান সংকট কেটে গেলে ২০১৪ ও তৎপরবর্তী ৩/৪ বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় ধরনের ঋণ চাহিদা সৃষ্টি হবে। বিনিয়োগযোগ্য অর্থের পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার প্রয়োজন হবে। এ জন্য দেশের সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে উপযুক্ত নীতি সহায়তার *[policy support]* প্রয়োজন পড়বে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সম্ভাব্য বিনিয়োগ ও প্রবৃদ্ধি সহায়ক নীতি প্রণয়নের প্রস্তুতি গ্রহণের সময় এখনই। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক তার প্রণীতব্য মুদ্রানীতিতে এবং ব্যাংকগুলোর বর্ধিত ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ ক্ষমতা সহায়ক নীতিতে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের উপযুক্ত সমন্বয় ঘটাতে পারে ঃ

- উৎপাদনশীল খাতে অধিকতর বিনিয়োগমুখী উচ্চ মূল্যস্ফীতি সমন্বয়ক ও উচ্চ প্রবৃদ্ধি সহায়ক মুদ্রানীতি *[inflation adjusted higher growth supportiive monetary policy]* প্রণয়ন।
- বিদ্যমান ঋণ শ্রেণিকরণ ও পুনঃতফসিলিকরণ নীতিমালা যৌক্তিকীকরণ [যা ঋণ খেলাপি সহায়ক নয়] এবং ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নির্ণয়ক নীতিমালায় অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক চাহিদার সময়োপযোগী প্রতিফলন।
- ব্যাংকিং খাতের সম্ভাব্য মোট ঋণ চাহিদার সাথে মোট ঋণ প্রদান ক্ষমতার ঘাটতি এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও ব্যালেন্স অব পেমেন্টের অনুকূল পরিস্থিতি বিবেচনায় বেসরকারি খাতে সীমিত মাত্রায় মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি বৈদেশিক ঋণ প্রবাহের সুযোগ রেখে এতদ্‌সম্পর্কিত বৈদেশিক মুদ্রা নীতিমালায় পরিবর্তন।
- Bangladesh Bank Order ১৯৭২ এর Article-7A(c) এ স্বীকৃত বিধির আলোকে সম্ভাব্য ঋণ চাহিদা ও যোগানের বিষয়ে পূর্বাভাষ *[forecasting]* বিশ্লেষণপূর্বক ব্যাংকিং খাত হতে সরকারের সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণ মাত্রার বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নীতি সহায়তার কারণে যে পরিমাণে ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদান ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে সে পরিমাণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভিশনের নিবিড়তা বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। আর নীতি পরিবর্তনের আগে 'পরিবর্তন প্রভাব বিশ্লেষণ' বা change impact analysis জরুরি। এরূপ বিশ্লেষণের পর প্রাপ্তব্য মোট সুবিধা হতে সম্ভাব্য অসুবিধাসমূহ সমন্বয় করে নীট উপকারের মাত্রা হিসাবায়ন করে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। তবে কাজগুলো যে অনতিবিলম্বে শুরু করা উচিত এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত থাকার কথা নয়।

■ *লেখক ঃ জেডি, বিআরপিডি, প্রধান কার্যালয়*

ভাষা-আন্দোলন : অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য

মোঃ জুলকার নায়েন

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির পর সৃষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটি ভারতের পশ্চিম ও পূর্বের দুই প্রান্তে দুটি পৃথক অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়। দুই অঞ্চলের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য ছিল ভিন্ন। পূর্ব পাকিস্তান অত্যন্ত জনবহুল এবং কৃষিনির্ভর একটি দেশ। অন্যদিকে, পশ্চিম পাকিস্তান হালকা বসতিপূর্ণ, উন্নততর ভৌত অবকাঠামোর অধিকারী। দুই অংশের মধ্যে ধর্ম ছাড়া ভাষা, জাতিগত চরিত্র এবং সংস্কৃতিও ছিল ভিন্ন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাজনীতি, অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব বাংলার (পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান নামে অভিহিত) মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এসময় পশ্চিমের অভিজাত শ্রেণির ভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা আসে শাসকশ্রেণির পক্ষ হতে। এমনই একটি পটভূমিতে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পূর্ব-বাংলায় গড়ে উঠেছিল। ভাষা আন্দোলনের গবেষক এবং অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমানের মতে, ভাষা আন্দোলন স্বল্পমাত্রার সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। স্বতন্ত্র একটি জাতিসত্তার বীজও বপন হয় এসময়। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির চেতনা প্রবল ছিল ঐ ভাষা আন্দোলনের মূলে।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক শ্রেণি পূর্ব-বাংলার ওপর যে আঞ্চলিক নিপীড়ন চাপিয়ে দেয় তারই প্রতিফলন ঘটে কখনও সংবিধান, কখনও অর্থনীতি, কখনও ভাষা সংক্রান্ত নীতির মধ্য দিয়ে (দেখুন আতিউর রহমান ও লেনিন আজাদ (১৯৮৫), ভাষা আন্দোলন: অর্থনৈতিক পটভূমি)। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৪৭-৫২ কালপর্বে বাংলা বিভাগের ফলে পূর্ব-বাংলা হতে ভারতে ব্যাপক পুঁজি পাচার হয়, ব্যবসা-বাণিজ্যে নানা সংকট তৈরি হয়, সরকারের পাটনীতির কারণে পাটচাষিরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হয়, সরকারি নীতির কারণে লবণসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য পূর্ব-বাংলার জনসাধারণ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চড়া দামে কিনতে বাধ্য হয়; এ সময় দেশের বিস্তৃত এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ফলে অর্থনৈতিক দুর্দশা ও বৈষম্যের শিকার এ অঞ্চলের সাধারণ মানুষ ভাষার ওপর আঘাতকে তাদের আর্থ-সামাজিক বিকাশের পথে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা বলে মনে করে আন্দোলনে ব্যাপক সাড়া দিয়েছিল। অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলামের মতে, 'পশ্চিমের কুক্ষিগত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষপাতিত্বমূলক নীতিমালা, দুই অঞ্চলের মধ্যে অসম সম্পদের বন্টন ও আর্থিক বিনিয়োগ - সব মিলিয়ে দুই অঞ্চলের মধ্যকার আর্থিক বৈষম্য ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলে।' কেমন ছিল সে-সময়ে পূর্ব-বাংলা নামক ভূ-খণ্ডটির আর্থসামাজিক অবস্থা এবং পূর্ব-পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র ?

১৯৫১ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যা ছিল ৭কোটি ৫৮লক্ষ ৪২হাজার; এর মধ্যে ৪কোটি ২০লক্ষ ৬৩হাজার জনই বাস করত পূর্ব-বাংলায় অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ। এ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন এলাকা ও শ্রেণির ভিতর শিক্ষার হার অনেক উঁচুতে থাকলেও সামগ্রিকভাবে পূর্ব-বাংলায় শিক্ষার হার ছিল বেশি। ১৯৫১ সালের আদম শুমারি অনুযায়ী গোটা পাকিস্তানের সাক্ষরতার হার ছিল ১৪.৭৬ ভাগ, কিন্তু পূর্ব-বাংলার সাক্ষরতার হার ছিল শতকরা ১৬ ভাগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ১৩.২ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের শ্রমশক্তির ৬৫.৫ ভাগ ছিল কৃষিক্ষেত্রে; অপরদিকে পূর্ব-বাংলার শ্রমশক্তির ৮৩.৩৪ ভাগই ছিল কৃষিক্ষেত্রে। ভারতবিভাগের সময় পাকিস্তানের দুই অংশের জিডিপি প্রায় সমানই ছিল, যদিও পশ্চিম পাকিস্তান রাস্তাঘাট, সেচব্যবস্থার সুবিধা ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নততর অবকাঠামো লাভ করে।

১৯৫০ এর শুরুতেই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল ভৌত অবকাঠামো ও মানব সম্পদ উন্নয়নে প্রচুর বিনিয়োগের মাধ্যমে। ফলে পঞ্চাশ ও ষাট দশকে পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতি দ্রুততর উন্নতি লাভ করে। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের ১.৯% এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ২.৭%। ষাটের দশকে এ ব্যবধান আরও বেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের ৪.৩% এর তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের প্রবৃদ্ধি হয় ৬.৪% (রেহমান সোবহান, ১৯৯৮)

মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রেও পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য তৈরি হয়। নিচের সারণিতে মাথাপিছু আয়- বৈষম্যের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে মাথাপিছু আয়ের বৈষম্য

(টাকার অংকে)

সাল	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য	বৈষম্যের অনুপাত
১৯৪৯/৫০	২৮৮	৩৫১	৬৩	২১.৯
১৯৫৪/৫৫	২৯৪	৩৬৫	৭১	২৪.১
১৯৫৯/৬০	২৭৭	৩৬৭	৯০	৩২.৫
১৯৬৪/৬৫	৩০৩	৪৪০	১৩৭	৪৫.২
১৯৬৯/৭০	৩৩১	৫৩৩	২০২	৬১.০

উৎস: রেহমান সোবহান, বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, (মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)

এছাড়া, কৃষি, শিল্প, রাজস্ব ব্যয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক ঋণের ব্যবহার, সড়ক যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের যে বৈষম্য বিরাজ করছিল তার সংক্ষিপ্ত চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

কৃষি ব্যবস্থা : ১৯৪৯-৫০ এর হিসাব অনুযায়ী পূর্ব-বাংলায় সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ৪লক্ষ ৪হাজার একর অর্থাৎ এর কৃষিজমির মাত্র ১.৫৮ ভাগ। পশ্চিম পাকিস্তানে সেচ-সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ছিল ২কোটি ২৩লক্ষ ৯হাজার একর অর্থাৎ এর কৃষিজমির শতকরা ৭৮.৪১ ভাগ। অবশ্য নদীমাতৃক দেশ হিসেবে পূর্ব-বাংলায় সেচের প্রয়োজনীয়তা কম ছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তবে পূর্ব-বাংলায় কৃষিকাজের জন্য ট্রাক্টর বা যন্ত্রকৌশলের ব্যবহার ছিল না বললেই চলে। ১৯৫০ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানে ৪৭লক্ষ একর জমি অর্থাৎ ২১ ভাগ জমি যান্ত্রিক চাষের আওতায় ছিল।

শিল্পায়ন : ১৯৪৭-পরবর্তী সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক কয়েকজন অবাঙালি শিল্পপতির উদ্যোগে কয়েকটি পাটকল, কয়েকটি মুদ্রণ-শিল্প ছাড়া পূর্ব-বাংলায় শিল্পের বিকাশ তেমন হয়নি। ১৯৫১ সালের অর্থনৈতিক জরিপ অনুযায়ী পূর্ব-বাংলায় মোট শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৩৩৩টি।

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেন

(৫ পৃষ্ঠার পর)

দীর্ঘদিন। ২০০৭ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। বড় ছেলে ইস্তেকবাল হোসেন ১৯৮৮ সালে অনুষ্ঠিত ডাকসু'র নির্বাচনে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে সাহিত্য সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিল। বর্তমানে সে আইন পেশায় নিয়োজিত। বড় মেয়ে মোতারেমা হোসেন একজন কৃষিবিদ। ছোট মেয়ে মোকাররমা হোসেন গৃহিণী। ছোট ছেলে ইস্তেকমাল হোসেন বাংলাদেশ ব্যাংকে যুগ্ম পরিচালক হিসেবে কর্মরত আছে।

ব্যক্তিগত জীবন ও শখ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

১৯৭৭ সালে আমি আইন পেশায় যোগদান করি। আমি গাজীপুর জেলা আইনজীবী সমিতির চারবার নির্বাচিত সেক্রেটারি আর চারবার নির্বাচিত সভাপতি। আমি এ পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছি, অনেক সভা-সেমিনারে অংশ নিয়েছি। লন্ডনে আমি দু'টি চলচ্চিত্রও করেছি। যার পরিচালক ছিলেন রবার্ট জেরেল বাব। আমার অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বিশ্বখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 20th Century Fox একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেয়।

পুত্র ইস্তেকবাল হোসেন ও ইস্তেকমাল হোসেনের সাথে ভাষাসৈনিক আলাউদ-দীন হোসেন

ভাষা আন্দোলনের কোন বিশেষ স্মৃতি কি রয়েছে ?

ভৈরবের লেনড্রেন পাট কোম্পানির বিদেশি ম্যানেজার মুরলি সাহেবের কথা মনে পড়ে। প্রচারপত্র বিলির সময় তার সাথে দেখা হলে আমার হাতে ৫০টি টাকা দিয়েছিলেন। সেসময় একজন বিদেশির এমন কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গিয়েছিল।

আর একদিন প্রচারপত্র বিলি শেষে ভৈরব রেলস্টেশনে গিয়ে দেখি ট্রেন নাই। রাত ১০টার দিকে একজন রেল কর্মচারী আমাদের বের হওয়ার আদেশ দিল। আমরা গ্রাহ্য করলাম না। সে সহকারী স্টেশন মাস্টারকে রিপোর্ট করলো। তিনি আমাদের পরনে ব্যাজ দেখে নিয়ে গেলেন তার বাসায়। আমাদের খাওয়ালেন, শোয়ার ব্যবস্থাও তার ঘরেই হলো। আরো অনেক স্মৃতি হৃদয়ে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

যে উদ্দেশ্যে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশে তার কতটুকু প্রতিফলন হয়েছে ?

ভাষা সংগ্রাম কোন রাজনৈতিক বা পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল বাঙালিদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া সব অনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। শেষ পর্যন্ত আন্দোলন মহাসংগ্রামে রূপ নেয়। সংগ্রামের শুরুতে আমাদের শ্লোগান ছিল "অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। প্রাপ্তি চাওয়ার চেয়ে অনেক বেশি। তবে স্বাধীনতার অর্ধ শতাব্দী পরও বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের ভাষা হিসেবে পূর্ণ মর্যাদা দেয়া হয়নি বলে আমি মনে করি।

■ *সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সাঈদা খানম, ডিজিএম, ডিসিপি*

ভাষা আন্দোলন

(৭ পৃষ্ঠার পর)

এর মধ্যে রেলওয়ে ওয়ার্কশপ এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত ৩টি পাটকল ছাড়া, অধিকাংশ শিল্পেই শ্রমিকসংখ্যা ছিল ১০০ জনের কম। সুতি ও বস্ত্র শিল্পের কারখানা ছিল ১৭টি, তার মধ্যে পূর্ব-বাংলায় পড়েছিল মাত্র ৩টি; অন্যান্য বড় কারখানার সংখ্যা ছিল ৩৭টি তার মধ্যে পূর্ব-বাংলায় পড়েছিল মাত্র ২টি। ১৯৪৮ সালে মোট ৫টি সিমেন্ট কারখানার মধ্যে ৪টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। সরকারি সহযোগিতার অভাব এবং শিল্পোদ্যোগের জন্য অনুকূল পরিবেশের অভাবের কারণেই পূর্ব বাংলায় অধিকসংখ্যক শিল্প গড়ে ওঠেনি বলে মনে করা হয়।

রাজস্ব ব্যয় : ১৯৪৮-৫২ কালপর্বে পূর্ব-বাংলা থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়েছে মোট ৯৬কোটি ৮৪লক্ষ টাকা। অপরদিকে, ব্যয় করা হয়েছে ৫কোটি ২১লক্ষ রুপি; অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের শতকরা ৫ ভাগের কিছু বেশি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের রাজস্ব আয়ে পশ্চিমের অবদান বেশি হওয়ায় রাজস্ব ব্যয় সেখানে বেশি করার যুক্তি দেখাতো পশ্চিম পাকিস্তানের কোন কোন অর্থনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ নুরুল ইসলাম (২০০৭) যুক্তি দেখিয়েছেন করাচিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় থাকায় সমস্ত দেশ থেকে অর্জিত আয় ও ব্যবসার ওপর করাচিতেই কর প্রদান করতে হতো বলে রাজস্ব আয় স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমে বেশি হবে; সেই কারণে উভয় প্রদেশের সত্যিকারের কর আদায়ের পরিমাপ করা যাবে না।

বৈদেশিক বাণিজ্য : ১৯৪৮-৫২ কালপর্বে সমগ্র পাকিস্তানের রপ্তানি বাণিজ্য থেকে অর্জিত হয় ৮৪৫কোটি রুপি যার মধ্যে ৪৬৪কোটি ২৫লক্ষ রুপিই (শতকরা ৫৫ ভাগ) আসে পূর্ব-বাংলার পাট ও অন্যান্য কাঁচামাল রপ্তানি করে। পূর্ব-বাংলা পণ্য রপ্তানি করে সরকারিভাবে এতো বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করলেও সরকারিভাবে মাত্র ১৬কোটি রুপি মূল্যের আমদানি করা হয় পূর্ব-বাংলার জন্য। এসময় বেসরকারিভাবে পূর্ব-বাংলার জন্য আমদানি করা হয় ১৬১কোটি ৪১লক্ষ রুপি যা ছিল প্রধানত ভোগ্যপণ্য। আর বেসরকারিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রায় সবটুকুই ছিল অবাঙালিদের দখলে। বৈষম্যমূলক বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রানীতির ফলে পূর্বের সম্পদকে পশ্চিমে ব্যাপকভাবে স্থানান্তরের পথ সুগম হয়।

সড়ক যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ : ভারত বিভাগের পর এক হিসাব হতে দেখা যায় পাকিস্তানে উন্নত সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল মোট ৮,৩৫২ মাইল। পশ্চিম পাকিস্তানে উন্নত সড়কের দৈর্ঘ্য ছিল ৭,৫৯৫ মাইল ; পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ৭৫৭ মাইল অর্থাৎ মোট উন্নত সড়কের মাত্র ৯ ভাগ। ভারতবিভাগের সময় সমগ্র পাকিস্তানে বিভিন্ন উৎস থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল মোট ৭১,৩৫৮ কিলোওয়াট। পূর্ব-বাংলায় বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ ছিল ৭,২৮৬ কিলোওয়াট অর্থ্যৎ মোট সরবরাহের শতকরা ১০.২১ ভাগ।

ওপরে বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি ও তাৎপর্য নিয়ে কিছু আলোচনা করা হলো। পরবর্তীতে ১৯৬০ এর দশকে আমরা দেখতে পাই পূর্ব ও পশ্চিমে দুই অর্থনীতির ধারণার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন এবং ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক মুক্তির যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছিল তা আজকের বাংলাদেশে কতটুকু অর্জিত হয়েছে তা নিয়ে বিভিন্ন মত থাকতে পারে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতি আজ একটি মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার অনেক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে জন্মহার কমানো, মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার কমানো, শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার হার বাড়ানো, দারিদ্র্যের হার কমানো, শিক্ষাঙ্গনে ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। তা সত্ত্বেও সামাজিক ও আর্থিক বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে সত্যিকার একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে আরও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

লেখক : ডিজিএম, এফআইসিএসডি, প্র.কা.

যাঁরা অবসরে গেলেন...

এ কে এম ফজলুর রহমান

(মহাব্যবস্থাপক)
যোগদানের তারিখ : ০৩/১২/১৯৮০
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০১/০১/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-১

মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ২৫/১০/১৯৮৩
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০১/০১/২০১৪
বিভাগ : সচিব বিভাগ

এ কে এম সিরাজুল ইসলাম

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ০৫/১১/১৯৮০
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ নূর-উন-নবী

(মহাব্যবস্থাপক)
যোগদানের তারিখ : ০৪/০৯/১৯৮০
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : পরিসংখ্যান বিভাগ

কানিজ ফাতেমা চেমন আরা বেগম

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ৩০/০৮/১৯৮৩
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০৯/০১/২০১৪
বিভাগ : এফইআইডি

বিশ্বনাথ সরকার

(মহাব্যবস্থাপক)
যোগদানের তারিখ : ০৯/০৭/১৯৮০
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : পরিসংখ্যান বিভাগ

ইউ কে এম আনোয়ারা বেগম

(অপারেশন ম্যানজার)
যোগদানের তারিখ : ৩১/১২/১৯৭৬
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০৬/০১/২০১৪
বিভাগ : আইটিওসিডি

মোঃ মোছলে উদ্দিন

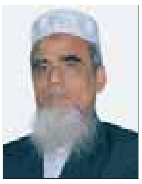

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
যোগদানের তারিখ : ২৪/০২/১৯৮২
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট

রুস্তম আলী হাওলাদার

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ০৫/০৪/১৯৭৫
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ আবদুস সামাদ-১

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ০১/১১/১৯৮০
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০১/০১/২০১৪
বিভাগ : এএন্ডবিডি

মোঃ আবদুল খালেক হাওলাদার

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ০৮/০২/১৯৭৮
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : ডিবিআই-২

মিলন কান্তি বড়ুয়া

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ১৫/০৯/১৯৭৬
অবসর গ্রহণের তারিখ : ০৯/০১/২০১৪
বিভাগ : ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট

আবু বকর রেজাউল হক

(যুগ্ম পরিচালক)
যোগদানের তারিখ : ২৪/০১/১৯৭৯
অবসর গ্রহণের তারিখ : ৩১/১২/২০১৩
বিভাগ : ডিবিআই-২

শোক সংবাদ

গোলাম মুর্তজা

সাবেক মহাব্যবস্থাপক (গবেষণা)
জন্ম : ২১/১১/১৯৪৮
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/১২/১৯৭৩
মৃত্যু : ২৬/৯/২০১৩

শিরিন আহমেদ

সাবেক উপ মহাব্যবস্থাপক
জন্ম : ১৮/৪/১৯৪৯
ব্যাংকে যোগদান : ১৪/১০/১৯৭৬
মৃত্যু : ১০/১০/২০১৩

মোঃ আবদুল বারী

উপ মহাব্যবস্থাপক (সিলেট অফিস)
জন্ম : ২৫/০৮/১৯৫৫
ব্যাংকে যোগদান : ০৯/০৩/১৯৭৬
মৃত্যু : ০৭/০১/২০১৪

মোঃ ইউসুফ আলী

যুগ্ম ব্যবস্থাপক (মতিঝিল অফিস)
জন্ম : ০১/০৩/১৯৫৭
ব্যাংকে যোগদান : ০৬/০৪/১৯৮২
মৃত্যু : ০২/০১/২০১৪

আবদুস সাহিদ

সাবেক ডিডি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো)
জন্ম : ০১/০১/১৯৪৩
ব্যাংকে যোগদান : ০৬/০৬/১৯৬৬
মৃত্যু : ২৭/০৭/২০১৩

গভর্নর ড. আতিউর রহমান ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিস উদ্বোধন করেন

অর্থনীতি ও আর্থিক খাত সম্প্রসারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নতুন শাখা

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭ ডিসেম্বর ২০১২। ময়মনসিংহ অফিস প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়নি। কর্তৃপক্ষের যথাযথ সিদ্ধান্তে খুব কম সময়ের মধ্যে ময়মনসিংহ শাখা প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন হয়। কাজটি শুরু হয় একটি আবেদনপত্রের মাধ্যমে। বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমন্বয় পরিষদ ১৩ জুন ২০১২ তারিখে গভর্নর ড. আতিউর রহমানের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, জামালপুর, শেরপুর ও টাঙ্গাইলের কেন্দ্রস্থল ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের প্রস্তাব করে। এ প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য গভর্নর ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেমকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ মজিবর রহমান, উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, যুগ্ম পরিচালক দুলাল চন্দ্র সরকার, উপ পরিচালক গোলাম মহিউদ্দীন এবং সহকারী পরিচালক ইন্দ্রাণী হক।

মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ

কমিটির পক্ষ থেকে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা স্থাপনের বিষয়ে খুব দ্রুত একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে পর্যালোচনা প্রতিবেদনের আলোকে কমিটি একটি স্মারক প্রস্তুত করে। কমিটির চেয়ারম্যান ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম স্মারকটি বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক পর্ষদের ৩৩৩তম সভায় উপস্থাপন করেন।

পরবর্তীতে ১৬ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে ২৯, দুর্গাবাড়ি সড়কে হৃদয় টাওয়ারে এক আনন্দঘন পরিবেশে ময়মনসিংহ জেলার সকল রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, জেলার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে গভর্নর ড. আতিউর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের উদ্বোধন করেন। রংপুরে বাংলাদেশ ব্যাংকের ৯ম শাখা স্থাপনের সুদীর্ঘ ২২ বছর পর ময়মনসিংহে স্থাপিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ম শাখা। বর্তমানে ময়মনসিংহ শহরের ২৯, দুর্গাবাড়ি সড়কে হৃদয় টাওয়ারে ভাড়া করা ভবনে এ অফিসের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকীর সহযোগিতায় ও তত্ত্বাবধানে গত ২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ময়মনসিংহ অফিসের নিজস্ব ভবন নির্মাণের জন্য ৬.৬০ একর জমি হস্তান্তর করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ শাখা অফিসের ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন তারা হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) শিবির বিচিত্র বড়ুয়া, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ড. উম্মে আফছারী জহুরা, এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা আব্দুল মজিদ। গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৩ ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান ময়মনসিংহে সদর উপজেলার বাড়েরা মৌজায় অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন।

জেলা প্রশাসক মুস্তাকিম বিল্লাহ ফারুকী

প্রশাসনিক অবকাঠামো

বর্তমানে এ অফিসে ৬৮ জন স্থায়ী ও ২৯ জন অস্থায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত রয়েছেন। ১৭ ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে ৩০ জন কর্মকর্তা ও ১৪ জন কর্মচারী নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ

অফিসের কার্যক্রম শুরু হয়। হৃদয় টাওয়ারে একটি মাত্র কক্ষে মহাব্যবস্থাপকের তত্ত্বাবধানে ময়মনসিংহ অফিসে বহালকৃত সকল পদমর্যাদার কর্মকর্তা ও কর্মচারী একটি যৌথ পরিবারের মতো অবস্থান করে অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে অফিসের কার্যক্রম শুরু করে। এ শাখার প্রথম এবং বর্তমান মহাব্যবস্থাপকের নাম মোঃআব্দুল হামিদ।

শাখা প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিত

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও আর্থিক খাত সম্প্রসারণে দেশের তৃতীয় বৃহৎ জেলা ময়মনসিংহের অবদান উল্লেখযোগ্য। এ অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকাণ্ডকে যথাযথভাবে মনিটরিংয়ের মাধ্যমে আরো সম্পৃক্তকরণ, তাদের কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিতকরণ এবং আর্থিক খাতের পাশাপাশি এ অঞ্চলের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান সম্প্রতি ময়মনসিংহ অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শন করেন। এসময় ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

এ শাখার অর্জন

স্থান সংকুলানজনিত এবং নতুন অফিসের প্রারম্ভিক পর্যায়ের নানান সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে কাজ চলতে থাকে এবং অফিসের কর্মকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমে শুরুতে বিদ্যমান ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ ও ২, কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, মহাব্যবস্থাপকের শাখা, সংস্থাপন শাখা, মনিহারি শাখা, প্রদান/আগাম/বেতন শাখা, ডিএবি শাখা ছাড়াও বর্তমানে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ খোলা হয়েছে। এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি এ বিভাগের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিদর্শন কার্যক্রম ও বিবরণী পর্যালোচনা করে এক্ষেত্রে বিরাজমান ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরণ, বিশেষ করে বেশ কিছু ব্যাংকের নারী উদ্যোক্তাদের এসএমই ঋণের সুদ হার ১৫%-১৬% থেকে কমিয়ে ১০% এ নির্ধারণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ লক্ষ্য

ভবিষ্যতে নতুন টাকা সরাসরি সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস হতে ময়মনসিংহ শাখায় স্থানান্তরের মাধ্যমে মজুদ করে রাখা যাবে। এ শাখা থেকে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী, রংপুর ও বগুড়া অফিসে নতুন টাকা স্থানান্তর করা সহজতর হবে। ময়মনসিংহ শাখা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বিতীয় বৃহত্তম শাখা। এই শাখার মাধ্যমে নতুন নোট বিতরণ, সঞ্চয়পত্র-প্রাইজবন্ড ক্রয়-বিক্রয়, ট্রেজারি কার্যক্রম এবং ক্লিয়ারিং হাউজ পরিচালনাসহ বিভিন্ন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা ড. উম্মে আফছারী জহুরার কাছ থেকে জমির দখলনামা বুঝে নিচ্ছেন সিএসডি'র ডিজিএম এ.টি.এম. আব্দুল খালেক। এ সময় ডিজিএম গাজী সাইফুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন

কাজের পরিধি

ময়মনসিংহের ছয়টি জেলায় বিভিন্ন ব্যাংকের প্রায় ৬০০টিরও অধিক শাখা রয়েছে। যা দেশের মোট ব্যাংক শাখার সাত শতাংশেরও বেশি। প্রাথমিকভাবে ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ ও ২, কৃষিঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তিবিভাগ, ডিএবি এবং বর্তমানে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ খোলা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহের মাধ্যমে ময়মনসিংহে বিদ্যমান ব্যাংক শাখাসমূহ মনিটরিংয়ের কাজ আরো জোরদার করা সম্ভবপর হয়েছে।

নতুন শাখার যত সমস্যা

বাংলাদেশ ব্যাংকের নতুন প্রতিষ্ঠিত একটি শাখা অফিস হওয়ায় ময়মনসিংহ অফিসের কর্মীদের সমস্যার অন্ত নেই। বিশেষভাবে স্থান সংকুলানজনিত কারণে অফিস কক্ষে বসার সমস্যা প্রকট। দেখা যায় যে, গত এক বছরেও কোন কোন কর্মকর্তার বসার জন্য সীট বরাদ্দ দেয়া সম্ভব হয়নি। লজিস্টিক সাপোর্ট অত্যন্ত সীমিত। কর্মচারীদের আবাসন ও ক্যান্টিন সুবিধার ক্ষেত্রেও রয়েছে ব্যাপক সীমাবদ্ধতা। ময়মনসিংহ অফিসের Networking System চালু না থাকায় প্রধান কার্যালয়ের সাথে সমন্বয় সাধন করে কাজকর্ম পরিচালনা করা কষ্টসাধ্য হয়, যার কিছুটা প্রধান কার্যালয়ে অবস্থিত স্কেলিটন ইউনিটের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। এখানে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাবকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করা হলে কর্মকর্তাদের অবসর বিনোদনের সুব্যবস্থা হবে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

জামালপুরে দুঃস্থ নারীদের নকশি কাঁথা সেলাই করার দৃশ্য। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকিতে একটি বেসরকারি ব্যাংক এসব দুঃস্থ নারীদের জন্য ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা করেছে

বগুড়ার নবাববাড়ি

জয়ন্ত কুমার দেব

বগুড়া নবাববাড়ি

কালে কালে বেলা হয়েছে অনেক। জমে আছে অনেক কথা আর ভিন্ন ভিন্ন গল্প। আবার গল্পের ধারাবাহিকতা এতটায় বিস্তৃত যে সব কিছু তুলে ধরা যায় না। ঠিক তেমনি বগুড়ার নবাববাড়ির গল্পও। জমিদারি, নওয়াবি থেকে একটি রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, কূটনৈতিক, জীবন-যাপন, শিক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সহমর্মিতা, সাধারণ মানুষের জন্য চিন্তা চেতনার সাথে মিশে আছে হাজারো গল্প। একেকটি গল্প বগুড়ার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হয়ে আছে। সঠিক যত্নের অভাবে হারাতে বসেছে। ইতিহাস হারাতে বসলেও এখনো নবাববাড়ির সদস্যদের আলাদা একটা মর্যাদার সাথেই দেখে বগুড়ার মানুষ।

বিভিন্ন বই, দলিলপত্র ও লোকমুখে জানা যায়, টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত দেলদুয়ারের বিশিষ্ট জমিদার বংশে সৈয়দ আব্দুস সোবাহান চৌধুরী জন্মগ্রহণ করেন। বৈবাহিক সূত্রে তিনি বগুড়ায় বসবাস শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকার জনহিতকর কার্যাবলীর স্বীকৃতিস্বরূপ সৈয়দ আব্দুস সোবাহান চৌধুরীকে ১৮৮৪ সালের ২০ মার্চ 'নওয়াব' উপাধিতে ভূষিত করেন। বৃটিশ শাসনামলে তিনি নওয়াবের মর্যাদা নিয়ে বগুড়ায় অবস্থান করেন। বগুড়া শহরের করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে নওয়াবের জন্য প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়। নবাববাড়ির সামনের সড়কটিকে বলা হয় নবাববাড়ি সড়ক। প্রাসাদটি আজো কালের সাক্ষী হয়ে আছে। তাঁর সময়ে তিনি বগুড়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে জমি প্রদানসহ আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। বগুড়ার উন্নয়নে তিনি নিজের জমির ওপর অনেক কিছু নির্মাণ করেন। সান্তাহার থেকে লালমনিরহাট রেল সড়ক নির্মাণ করেন নিজেদের জায়গার ওপর।

সৈয়দ আব্দুস সোবাহান চৌধুরী ছিলেন টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট জমিদার। তিনি বগুড়ার মানিকপুর এলাকার মীর সারোয়ার আলীর বোন তহুরুন নেছাকে বিয়ে করেন। স্ত্রী তহুরুন নেছা মারা গেলে সৈয়দ আব্দুস সোবাহান চৌধুরী জমিদারি লাভ করেন। তাদের সংসারে জন্ম নেন পুত্র সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরী ও কন্যা আলতাফুননেছা। সৈয়দ আব্দুস সোবাহান চৌধুরী জমিদারি লাভের পর বগুড়া অঞ্চলে শিক্ষা ও সাধারণ মানুষের জন্য সেবামূলক নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যেসব সুবিধাদি আজও বগুড়াবাসী ভোগ করছেন। ওই সময়ে তিনি নির্মাণ করেন (১৮৮২ সালে) ভিক্টোরিয়া মদ্রাসা। এটি ১৯৫৫ সালে হাই স্কুলে রূপান্তরিত হয় এবং পরে (বর্তমানে) বগুড়া সেন্ট্রাল হাই স্কুল নামকরণ করা হয়। তিনি উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরি, হাসপাতাল স্থাপন করেন। উডবার্ন পাবলিক লাইব্রেরিটি আজো টিকে আছে। হাসপাতালটি এখন তহুরুন নেছা মহিলা পরিষদ হয়েছে। সৈয়দ আলতাফ আলী চৌধুরীর কন্যা আলতাফুননেছাকে বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী। আলতাফ আলীর সংসারে জন্ম নেন মোহাম্মাদ আলী (১৯.১০.১৯০৯)। মোহাম্মাদ আলী তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে মোহাম্মাদ আলী বিয়ে করেন টাঙ্গাইলের দেলদুয়ার এলাকার লেফটেন্যান্ট মোহাম্মদ হোসেনের কন্যা হামিদা বানুকে। মোহাম্মদ আলীর সংসারে দুই পুত্র সৈয়দ হাম্মাদ আলী ও সৈয়দ হামদে আলী। এসময়েও বগুড়ায় যাওয়া আসা ছিল তৎকালীন

মোহাম্মাদ আলী প্যালেস এন্ড মিউজিয়াম পার্কের প্রবেশপথ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলীর। তিনি ১৯৫৩ সালের ১৭ অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৬২ সালে জাতীয় আইন পরিষদের সদস্য পদে মোহাম্মাদ আলী বগুড়ার গাবতলী-সারিয়াকান্দি আসন থেকে নির্বাচিত হয়ে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হন। ১৯৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারি পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকাকালে ঢাকার ধানমণ্ডির বাসভবনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫৩ বছর বয়সে বগুড়ার নবাববাড়ির কৃতি সন্তান মোহাম্মাদ আলী ইন্তেকাল করেন। মোহাম্মাদ আলীর নামে বগুড়ায় আজো দাঁড়িয়ে সেবা দিচ্ছে মোহাম্মাদ আলী হাসপাতাল, আলতাফুননেছা খেলার মাঠ (যা বগুড়ার একমাত্র খেলার মাঠ), সার্কিট হাউস, দেড়শো বছরের পুরনো বগুড়া জিলা স্কুল। বগুড়া জেলা প্রশাসনের অফিস গড়তে আংশিক জায়গা প্রদানসহ বিভিন্নভাবেই বগুড়াকে আধুনিকভাবে গড়ার চেষ্টা ছিল অফুরন্ত। বগুড়ার নবাববাড়ির ইতিহাস ছিল রূপকথার মতো।

বর্তমানে সেই অতীত ইতিহাস বিলীন হতে চলেছে। কালের হাওয়া মুছে ফেলছে উজ্জ্বল ইতিহাস। বর্তমানে মোহাম্মাদ আলীর ছোট পুত্র হামদে আলী বগুড়ায় অবস্থান করছেন এবং নবাব প্রাসাদটির দায়িত্ব নিয়েছেন। গড়েছেন নবাববাড়ির ইতিহাস নিয়ে মিউজিয়াম। নাম দেওয়া হয়েছে মোহাম্মাদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড পার্ক। নবাব জীবন প্রণালি এবং নবাবি আমলের সভ্যতা-কৃষ্টি, সংস্কৃতিকে বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার জন্য কয়েকজন গুণী শিল্পীর অক্লান্ত শ্রম ও মেধায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোহাম্মাদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড পার্ক। দেশের উত্তর জনপদের কেন্দ্রস্থল বগুড়া শহরের প্রাণকেন্দ্র করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর ঘেঁষে নবাব প্যালেসের ভিতরে তৈরি করা হয়েছে এই মিউজিয়াম অ্যান্ড পার্ক। এ পার্কে নবাব বাড়ির ওই সময়ে পাইক পেয়াদা বরকন্দাজের রূপকথা মডেল করে সাজানো হয়েছে।

নবাব প্যালেসে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রায় দুশো বছর আগের বিশাল নকশা করা কাঠের দরজা দেখে ভড়কে যেতে পারেন। এই বুঝি নবাবের কোন দারোয়ান ছুটে আসছে কোন ফরমায়েশ নিয়ে। গা ছমছম করে উঠবে। প্রধান ফটক পেরিয়ে একটু ভিতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে তরুণী-কৃষানি বধূ অপেক্ষা করছে তার প্রেমিক কৃষাণের জন্য। পুরনো প্যালেসটি বিশাল এক জাদুঘর। বিনোদন কেন্দ্র, জোড়া ঘোড়ার গাড়ি, কোচোয়ানদের হাতে চাবুক। বগুড়ার নবাববাড়ির অতীত দিনের নেপালি দারোয়ান, মালি, পালকি, বেহারা, কোচোয়ান, টমটম, সিংহ, বাঘ, কুমির, ময়ূর, রাজহাঁস, বিভিন্ন পাখির প্রতিমূর্তি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। নবাববাড়ি বিরাট হলরুমের দেয়ালে রয়েছে নবাব আব্দুস সোবাহান চৌধুরী, নবাবজাদা আলতাফ আলী চৌধুরী, তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মাদ আলী, সৈয়দ তহুরুননেছা চৌধুরানী, সৈয়দ আলতাফুননেছা চৌধুরানীর প্রতিকৃতি। নবাব আমলের এই ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে মরহুম শিল্পী আমিনুল করিম দুলাল প্রথম ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সৈয়দ ওমর আলী চৌধুরীর উদ্যোগে শিল্পী দুলাল তার সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে একদিকে যেমন নবাববাড়িকে রক্ষা করেন তেমনি বাড়িটিকে দর্শনীয় স্থানে রূপদানের চেষ্টা করেন। নবাববাড়ির অতিথি আপ্যায়ন, বিলিয়ার্ড খেলা, পড়ার ঘরে বই সাজানো, জলসা ঘরে জলসার দৃশ্য, নায়েবের খাজনা আদায় এমন অনেক দৃশ্যকে জীবন্ত করে তোলার জন্য ভাস্কর্য নির্মাণ করেছেন শিল্পী দুলাল। নবাব প্যালেস পার্কে শিশুদের বিনোদনের জন্য মিনি ট্রেন ভ্রমণ, কৃত্রিম বিমান ভবন, দোলনা, স্লিপার ঢেঁকি, কৃত্রিম পশুপাখি তৈরি করা হয়েছে। পার্কে গড়ে উঠেছে শিশু-কিশোরদের খাবার ও খেলনা সামগ্রী ক্রয় কেন্দ্র। বিশেষ করে বলতে হবে দেশের একমাত্র শতবর্ষি কর্পূরের গাছ রয়েছে এ নবাববাড়িতে। বিশাল এ গাছটি দেখতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এখনো ভিড় জমান।

১৯৯৮ সালের মে মাসে মোহাম্মাদ আলী প্যালেস মিউজিয়াম অ্যান্ড পার্ক বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের জন্য খোলা থাকে। টিকেট কিনে মূল গেট পার হতে হয়। এরপর ট্রেন, দোলনা, বিমানে চড়া এবং নবাববাড়ির ভিতরে (পারিবারিক জাদুঘর) প্রবেশ করতে আলাদা টিকিট প্রয়োজন হয়। বর্তমানে এই মিউজিয়াম দেখাশুনা করেন মোহাম্মাদ আলীর পুত্র সৈয়দ হামদে আলী চৌধুরী। তিনি দীর্ঘদিন কানাডায় অবস্থানের পর গত কয়েক বছর আগে দেশে ফিরে পৈতৃক বাড়িতে অবস্থান করছেন। নবাববাড়ির সাথে মরহুম শিল্পী আমিনুল করিম দুলাল কারুপল্লী নামের একটি স্টুডিও তৈরি করেন। এ স্টুডিওটি সারা দেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ স্টুডিওর মধ্যে আদিম মানুষের আদিম জীবন প্রণালি নিয়ে গড়া হয় আদিম গুহা।

বগুড়া নবাববাড়ির একাংশ

যা দেখতে সারা দেশ থেকে মানুষ ভিড় জমাতো।

বর্তমানে কারুপল্লী নেই। কারুপল্লীর জায়গাটি নবাব পরিবারের হওয়ায় সেই জায়গায় এখন গড়ে তোলা হচ্ছে বহুতল বাণিজ্যিক ভবন। সে দিন আর নেই। নবাববাড়ি শুধু নবাব প্যালেসটি নিয়ে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিন যাচ্ছে, যত্নের অভাবে ক্ষয়ে যাচ্ছে ইতিহাস। স্মৃতি ধরে রেখেছে নবাব প্যালেসে গড়ে ওঠা স্মৃতি জাদুঘর।

■ *লেখক: ডিএম, বাংলাদেশ ব্যাংক, বগুড়া*

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী ব্যাংকের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ তত্ত্বাবধান করছেন। বিভাগগুলোর মধ্যে রয়েছে ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ডিবিআই-১, ডিবিআই-২ ও ডিবিআই-৪। এ বিভাগগুলো বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি, ইসলামি ও বিদেশি ব্যাংক এবং সেই সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুপারভিশনের কাজ করছে। এ সাক্ষাৎকারে তিনি ব্যাংক সুপারভিশন নিয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য সাম্প্রতিককালে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে? এতে করে ব্যাংকিং খাতে কি কোনো গুণগত পরিবর্তন আসবে?

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। সুপারভিশনে কৌশলগত পরিবর্তন বাস্তবায়নে সাম্প্রতিক সময়ে এ বিভাগ বেশ কিছু নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। যেমন, ব্যাংকের সার্বিক ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ ও উদ্ভূত ঝুঁকি নিরসনে নিরলসভাবে কাজ করার জন্য ব্যাংকগুলোতে পৃথক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ইউনিট ও পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের সমন্বয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন; রিস্ক রেটিং নির্ণয় ও তা ক্যামেলস্ গাইডলাইনের আলোকে ব্যবস্থাপনার রেটিং নির্ণয়ের সাথে অন্তর্ভুক্ত করা, এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ, জাল-জালিয়াতি প্রতিরোধে সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট শিট, স্ট্রেস টেস্টিং ব্যবস্থা ও গাইডলাইন, কুইক রিভিউ রিপোর্ট, ডায়াগনস্টিক রিভিউ রিপোর্ট ইত্যাদি প্রবর্তন, ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন সংশোধন ও যুগোপযোগীকরণ, তারল্য ব্যবস্থাপনায় নজরদারি জোরদারকরণ, সুপারভিশন সংক্রান্ত টাউন হল সভা আয়োজন, বৃহদাংক ঋণ মনিটরিং সফটওয়্যার প্রবর্তন, পুঁজিবাজার বিনিয়োগ সম্পর্কিত নীতিমালা সংশোধন, ইসলামি ইন্টারব্যাংক ফান্ড মার্কেট চালু, ব্যাংক সুপারভিশন স্পেশালিস্ট কাঠামো প্রবর্তন ইত্যাদি। গৃহীত ব্যবস্থার ফলে অফ-সাইট সুপারভিশন কার্যক্রমে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি দায়বদ্ধ। জাল-জালিয়াতির পরিমাণ কমে এসেছে, ঝুঁকি সহনীয় মাত্রা বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকগুলো পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের দিকে ঝুঁকছে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেও ব্যাংকগুলো অনেক দূর এগিয়েছে। ফলে ব্যাংকগুলো আরো শক্তিশালী হবে এবং দেশের অর্থনীতিতে কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারবে।

নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী

"ব্যাংকগুলো অনেক সময় ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তথা সুনাম বজায় রাখার জন্য অনিয়মগুলো এড়িয়ে যায়। এসব কর্মকাণ্ড সরেজমিনে তদন্ত করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখার জন্য অন-সাইট সুপারভিশন প্রয়োজন।

– মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী
নির্বাহী পরিচালক
বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্প্রতি পরিদর্শন বিভাগকে কয়েকটি বিভাগে ভাগ করে এর আওতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?

বিভিন্ন সময়ে অফ-সাইট তথ্যাদি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ব্যাংকগুলো অনেক সময় ভুল তথ্য সরবরাহ করে থাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংকের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ও সুনাম বজায় রাখার জন্য অনিয়মগুলো এড়িয়ে যায়। এসব কর্মকাণ্ড সরেজমিনে তদন্ত করে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ব্যাংকিং খাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখার জন্য অন-সাইট সুপারভিশন প্রয়োজন। বর্তমানে ৫৬টি ব্যাংকের মোট শাখার সংখ্যা ৮৪৮২টি। এছাড়া ৩১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এ সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিবিড়ভাবে তদারক করার জন্য ব্যাংকগুলোকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ৪টি অন-সাইট ডিপার্টমেন্ট গঠন করা হয়েছে। ডিবিআই-১ বেসরকারি ব্যাংক, ডিবিআই-২ সরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ডিবিআই-৪ ইসলামি ও বিদেশি ব্যাংকে পরিদর্শনের কাজ পরিচালনা করে। এছাড়া ডিবিআই-৩ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের পরিদর্শন কাজ পরিচালনা করে থাকে। সম্প্রতি ইসলামি ও বিদেশি ব্যাংক পরিদর্শনের জন্য ডিবিআই-৪ বিভাগটি গঠন করা হয়েছে। এতে পরিদর্শন কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

উল্লেখ্য, গ্রাহকদের অভিযোগ নিষ্পত্তি ও তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনার জন্য ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড কাস্টমার সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট কাজ করছে। এছাড়াও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিদর্শনের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্সপেকশন ডিপার্টমেন্ট এবং মানি লন্ডারিং সংক্রান্ত কার্যক্রম তদারক করার জন্য বিএফআইইউ রয়েছে।

পরিদর্শন বিভাগসমূহের কার্য পরিচালনায় কোনো নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি?

কিছুদিন পূর্বেও ব্যাংকগুলোকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ৪টি ত্রৈমাসিকের ওপর ভিত্তি করে সরেজমিন পরিদর্শন পরিচালনা করা হতো। ফলে কিছু ব্যাংক ডিসেম্বর এবং কিছু ব্যাংক মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর ভিত্তি ধরে

পরিদর্শন করা হতো। এ কারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ ছাড়াই সিংহভাগ ব্যাংকের বার্ষিক স্থিতিপত্র প্রস্তুত ও তা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিরীক্ষা করে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হতো। এতে ব্যাংকের অনেক দুর্বলতা উন্মোচিত হতো না এবং স্টেকহোল্ডারগণ প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতেন না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যাংকসমূহের ৬০%-৭০% ঋণ কভার করে এরূপ শাখাসমূহের ওপর ২০১২ হতে সব ব্যাংক ৩১ডিসেম্বর ভিত্তিক (বিকেবি ও রাকাব ৩০জুন ভিত্তিক) পরিদর্শন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত না করে বাংলাদেশ ব্যাংকে দাখিল করা হতে বিরত থাকার জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। ৩১ডিসেম্বর ভিত্তিক কর্মসূচির পর পূর্বের ন্যায় সারা বছরের পরিদর্শন কর্মসূচি একত্রে প্রণয়ন না করে শাখার গুরুত্ব বিবেচনা করে ত্রৈমাসিক কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া, অন-সাইট ও অফ-সাইট পরিদর্শনের মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে। সরেজমিন পরিদর্শনে যাওয়ার পূর্বে বিভিন্ন বিভাগ হতে গুরুতর অনিয়মসহ নানা অনিয়ম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে এবং পরিদর্শন বিষয়ে ইন হাউজ ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২ ও ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশনের সমন্বয়ে প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ৪টি ও বিশেষায়িত ১টি ব্যাংকের ওপর ডায়াগনস্টিক এক্সামিনেশন পরিচালনা করা হয়েছে যা ব্যাংকগুলোর সম্পদের মান, তারল্য ব্যবস্থাপনা এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন সিস্টেমের ওপর একটি সম্যক ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

অফিসে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী

এছাড়া ডিবিআই কর্তৃক সম্পাদিত Core Risk Inspection আরও সুচারুরূপে প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং সকল পরিদর্শন প্রতিবেদন দ্রুততম সময়ে প্রস্তুত ও এর পরিপালনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে।

ব্যাংকের সংখ্যা এখন আগের তুলনায় বেড়েছে। পাশাপাশি কাজের পরিধিও বেড়েছে। সেক্ষেত্রে ডিবিআই'তে কার্যরত জনবল কী যথেষ্ট রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা পূর্বের ৪৭টি হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬টিতে উত্তীর্ণ হয়েছে। নতুন ৯টি ব্যাংক ব্যতীত প্রতিটি ব্যাংকের আবার বিপুল সংখ্যক শাখা রয়েছে। সবগুলো শাখা প্রতি বছর পরিদর্শনের আওতায় আনা সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে ব্যাংকের মোট ঋণের ৬০%-৭০% কভার করে এমন শাখাগুলোকে পরিদর্শনের আওতায় আনা হয়। এছাড়া যে সব ব্যাংকের ক্যামেলস্ রেটিং ১ বা শক্তিশালী সে সব ব্যাংক প্রতি বছর পরিদর্শন করা হয় না। এতকিছুর পরও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিদর্শন সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে। তাছাড়া, নির্দিষ্ট বার্ষিক পরিকল্পনার অতিরিক্ত হিসেবে প্রায়ই অফ-সাইট সুপারভিশন ডিপার্টমেন্ট, বিআরপিডি ইত্যাদি ডিপার্টমেন্টের চাহিদার প্রেক্ষিতে অনেক বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়। এর ফলে নিয়মিত পরিদর্শন কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে। সব মিলিয়ে নিয়মিত ও বিশেষ পরিদর্শন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিচালনার জন্য ডিবিআই'তে বিদ্যমান কর্মবল যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয় না। ডিবিআই'তে আরও দক্ষ জনবল নিয়োজিত করা এবং তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

সম্প্রতি গৃহীত Integrated Supervision System সম্পর্কে কিছু বলুন।

যেহেতু একটি নির্দিষ্ট সময় পর পর ব্যাংকের পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়, সেহেতু সব ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যাদি পরিদর্শন বিভাগের কাছে থাকে না। ফলে ব্যাংকের মুখ্য আর্থিক নির্দেশকগুলো বিশেষ করে ঋণ ও অগ্রিমের শাখাওয়ারী প্রবৃদ্ধি, সেক্টরভিত্তিক ঋণের সম্প্রসারণ ইত্যাদি সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় না। ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম বিশেষ করে ঋণ ও অগ্রিম, বিনিয়োগ ইত্যাদির হালনাগাদ তথ্যাদি অবহিত হওয়ার জন্য সম্প্রতি Integrated Supervision System নামে একটি সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারে ব্যাংকগুলো মাসিক ভিত্তিতে তাদের শাখাওয়ারী তথ্যাদি আপলোড করছে। এ সিস্টেমটি একটি ব্যাপক পরিসরভিত্তিক সফটওয়্যার যার মাধ্যমে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রধান কার্যালয় এবং শাখাসমূহের কার্যক্রম আরো অধিক সময়োপযোগী ও কার্যকরভাবে মনিটরিং করা সম্ভব হবে ও প্রতিটি পর্যায়েই ওয়েব পোর্টাল ব্যবহার করে সংগৃহীত তথ্য যাচাইপূর্বক বিশ্লেষণ করে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবরে উপস্থাপন করা যাবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকসমূহের প্রধান কার্যালয় ও অথরাইজড ডিলার শাখাসমূহের তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ শুরু হয়েছে। একই সাথে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়সহ সকল শাখা হতে তথ্য সংগ্রহ নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এবং এ বছরের প্রথমার্ধের মধ্যেই তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

ফলে মাসিক ভিত্তিতে ডিবিআই'র কর্মকর্তাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ব্যাংকের বিনিয়োগ সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং কোন নির্দিষ্ট শাখায় অস্বাভাবিক বিনিয়োগ প্রবৃদ্ধি ঘটলে প্রতিকারমূলক ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

পরিদর্শন বিভাগ একটি রিপোর্টের ফরমেট ব্যবহার করছে। এতে রিপোর্টের মান উন্নত হয়েছে কি?

আমি মনে করি, এতে রিপোর্টের মান উন্নত হয়েছে। ইতিপূর্বে ব্যাংকগুলোর প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন প্রতিবেদন মূলত ঋণ-ভিত্তিক, অপ্রয়োজনীয় তথ্য/সারণিযুক্ত হওয়ায় অনেক বড় আকারের হতো এবং এর প্রস্তুতিতেও বেশি সময় ব্যয় হতো। বর্তমানে এ ধরনের প্রায় ১৫টি বিষয় প্রতিবেদনে না দিয়ে ওয়ার্কিং পেপার হিসেবে রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তাছাড়া, প্রতিবেদনে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ অনুপাত, পলিসিগত বিচ্যুতি, ঋণ, বৈদেশিক বিনিময় কার্যক্রম, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, আন্তঃশাখা/আন্তঃব্যাংক লেনদেনের বিষয়গুলোকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ফোকাসে রাখা হচ্ছে যার ফলে প্রতিবেদনের অবয়ব কমে গেছে কিন্তু এর কার্যকারিতা ও সময়োপযোগিতা অনেক বেড়ে গেছে। অধিকন্তু, পরিদর্শন প্রতিবেদনকে আগের চেয়ে অনেক বেশি রিস্ক ফোকাসড করতে বিভিন্ন কার্যক্রম/পরিকল্পনা বিবেচনাধীন রয়েছে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

পদোন্নতি

নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি

মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া

মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিংয়ে বি. কম (সম্মান) ও এম. কম ডিগ্রি লাভ করেন এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় হতে ব্যাংকিং ও ফাইন্যান্সে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া ১৯৮৪ সালে সহকারী পরিচালক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ চাকরিজীবনে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও বগুড়া অফিস ছাড়াও প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট, আইন বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোঃ আবদুর রহিম

বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুর রহিম ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ১৯৮৪ সালে সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতিতে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি ও আইবিএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের স্কলারশিপের অধীনে যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেন। বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট, রাজশাহী অফিস ছাড়াও তিনি প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিয়োগ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

মোঃ আবদুস সাত্তার

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুস সাত্তার ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (বিশেষায়িত) পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। মোঃ আবদুস সাত্তার ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন। তিনি পরিসংখ্যান বিভাগ, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো এবং মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্টে দায়িত্ব পালন করেন। মোঃ আবদুস সাত্তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ হতে সম্মানসহ এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত দায়িত্ব পালন এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণ/সেমিনারে অংশগ্রহণের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও নেপাল ভ্রমণ করেন।

জিন্নাতুল বাকেয়া

বাংলাদেশ ব্যাংক রাজশাহী অফিসের মহাব্যবস্থাপক জিন্নাতুল বাকেয়া ১৬ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে নির্বাহী পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) এবং এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। জিন্নাতুল বাকেয়া ১৯৮৪ সালে প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। তিনি মতিঝিল অফিস, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট, ডিপার্টমেন্ট অব কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট, পেমেন্ট সিস্টেমস্ ডিপার্টমেন্টের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার ও দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাজ্য, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

রোকেয়া আক্তার

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-২ এর উপ মহাব্যবস্থাপক রোকেয়া আক্তার ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে অনার্স করেন এবং পরবর্তীতে অর্থনীতিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। রোকেয়া আক্তার ১৯৮৮ সালে সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে তিনি সিলেট অফিস, কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট ও ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

মনোজ কুমার বিশ্বাস

ফরেক্স রিজার্ভ ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক মনোজ কুমার বিশ্বাস ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়ে মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে যোগদান করেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একাউন্টিংয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে তিনি রংপুর ও খুলনা অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন, কারেন্সী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ফরেক্স রিজার্ভ এন্ড ট্রেজারী ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় শীতবস্ত্র বিতরণ

সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর) কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অন্যান্যবারের মতো এবারও ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শীতার্ত অসহায় মানুষের জন্য শীতবস্ত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে প্রদান করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এসব শীতবস্ত্র যথারীতি বিতরণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে ১৮ জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ইউনাইটেড কমার্শিয়াল

ঢাকার বিভিন্ন ফুটপাতে বসবাসকারী শীতার্ত মানুষের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষে কম্বল বিতরণ করা হয়

ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক, ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক লিমিটেড, সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড, কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন, এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড, হাবিব ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক অব টোকিও, সিটি ব্যাংক লিমিটেড, ব্যাংক আল-ফালাহ, এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড ও Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ প্রায় ১৪ হাজার কম্বল সরাসরি জমা দিয়েছে এবং প্রায় লক্ষাধিক কম্বল ব্যাংকগুলো তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বিতরণ করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রাপ্ত কম্বল ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মাধ্যমে দেশজুড়ে বিতরণ করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিগঞ্জ, পাবনার চর আশুতোষপুর, রংপুরের মনোহর, রাজশাহী সদর, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, কমলগঞ্জ ও কুলাউড়া, পাবনার কাশিনাথপুর, বগুড়ার মধুপুর, পঞ্চগড়ের ইসলামবাগ, সিলেটের ধোপাদিঘীরপাড়, যশোর সদর, খুলনা সদর, লালমনিরহাট, শেরপুরের ঝিনাইঘাট ইউনিয়ন, কুষ্টিয়ার দৌলতপুর, চাঁদপুরের আমুয়াকান্দা, লালমনিরহাটের হাতিবান্ধা, মুন্সিগঞ্জের লৌহজং, টঙ্গিবাড়ী এবং শ্রীনগর, বরিশালের বাবুগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জের নারায়ণপুর, খুলনার বানরগাতি, জামালপুরের চরাঞ্চল, কিশোরগঞ্জ সদর, নরসিংদীর শিবপুর, কুমিল্লা সদর, ঢাকার ডেমরা, গাজীপুরের কালীগঞ্জ, বগুড়ার সারিয়াকান্দি, রাজশাহীর গোদাগাড়ী, ঢাকার মতিঝিল, আইজি গেইট, মিরপুর, বনানী, মোহাম্মদপুর, কমলাপুর, গুলশান, বারিধারা, রায়ের বাজার এবং ডেমরা, কুমিল্লার রবিদাসপাড়া ও সুজানগর, টাঙ্গাইলের মির্জাপুর, ভোলার চরাঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে শীতার্তদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি

মোঃ লুৎফুল কবির

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ লুৎফুল কবির ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগ দেন। তিনি পরিসংখ্যান বিষয়ে বিএসসি (সম্মান) ও এমএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকরিজীবনে তিনি পরিসংখ্যান বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোঃ মাছুম পাটোয়ারী

বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে বাংলাদেশ ব্যাংকে যোগদান করেন। চাকরিজীবনে তিনি ব্যাংকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ যেমন হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট, ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ এবং কৃষি ঋণ বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংক, সিলেট এবং রাজশাহী অফিসেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

মোঃ আব্দুল বারী

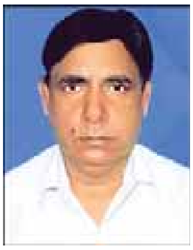

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল বারী ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। ১৯৮০ সালে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে যোগদান করেন। তিনি অর্থনীতিতে বি. এ (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। চাকরিজীবনে তিনি কম্পিউটার বিভাগ, পরিসংখ্যান বিভাগ, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, মনিটারি পলিসি ডিপার্টমেন্ট বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন।

এ, কে , এম ফজলুল হক মিঞা

বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক এ, কে, এম ফজলুল হক মিঞা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি লাভ করেছেন। তিনি ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের চাকরিতে সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে যোগদান করেন। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিসংখ্যানে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

কবিতা

আমরা গার্মেন্টস্ কর্মী, বন্দি কয়েদি

হাসিনা মমতাজ

আমরা গার্মেন্টস্ কর্মী জেলখানার বন্দি কয়েদি, আমরা গার্মেন্টস্ কর্মী।
সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠে নাকে মুখে গুঁজে
খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়ি পায়ে হেঁটে, ঢুকে যাই খোঁয়াড়ে সকাল আটটায়
সেই খোঁয়াড়েই থাকতে হয় রাত আটটা/দশটা
কিংবা কাজ বেশি হলে অনেক সময় ভোর হয়ে যায়।
আমরা গার্মেন্টস্ কর্মী, জেলখানায় বন্দি কয়েদি।
বলি রানা প্লাজার কথা, অক্লান্ত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
করে দেই মালিকের মুনাফা, দেশে আনি হাজার হাজার বৈদেশিক মুদ্রা
তবে আমাদের দেখার নেই কেউ, বেতনের লোভ দেখিয়ে
আমাদের নিয়ে ঢুকায় সেই রানা প্লাজার খোঁয়াড়ে।
কলামে ধরেছে ফাটল বিল্ডিং গিয়েছে হেলে
এই কথা আমরা তুলে দিয়েছিলাম মালিকের কানে।
মালিক হলো রাজা মহারাজা, আমরা হলাম পশু
তাই আমাদের আর্তচিৎকারে, মালিকের হয় না কিছু।
রানা প্লাজা ধসে গেল
দশ তলা ভবন তার হয়ে গেল স্যান্ডউইচ খাবার
আমাদের আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস কাঁপে,
এক নিমিষেই মারা পড়ি হাজার জনের বেশি
যদিওবা কেউ বাঁচি অঙ্গহানি হয়ে
হাত বা পা কাটা পড়ে কেউবা আবার, মানসিকভাবে পাগল হয় ভয়ে
ভুলে যেওনা আমাদের শ্রম ঘাম দিয়ে দেশের পুঁজি বাড়ে
আমাদের তোমরা ক্রীতদাস ভাবা বন্ধ কর
নইলে আমরা সবাই মিলে এক সাথে জ্বলব।
আমরাও যে মানুষ, আছে জীবনের নিরাপত্তা
এই কথাটা একটু ভাবুন আছে আমাদেরও সত্তা।

দুনিয়াদারি

মোঃ আলাউদ্দীন (আলীফ)

ভোগ বিলাস ফূর্তিতে ব্যস্ত দুনিয়াদারিতে-
বাড়ি গাড়ি জমি টাকায় মত্ত স্বপ্নপুরীতে।
অল্প দিনের এই পৃথিবী পায় না মন সাড়া
অনন্ত জীবন পরকাল দেয় না হৃদয় নাড়া।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত করেছো কতোই কিছু
যাচ্ছে চলে সময় ভাবছে না মোটে পিছু।
নেক আমলে নেই চেষ্টা পেয়েও প্রশ্নোত্তর
ভয়াবহ এর পরিণাম দেখবে অতি সত্বর।

আযান শুনলে আসে ভিন্ন কাজে মনোযোগ
বেহেস্তের চাবি নামাজ পড়ার হয় না সুযোগ।
শিশুকাল হতে দিনে রাতে পড়ছো কত বই-
সর্বশ্রেষ্ঠ কুরআন শরীফ বোঝার সময় কই ?

অসুখ-বিসুখ আপদ-বিপদ আসলে সম্মুখে
আল্লাহ্ ছাড়া উপায় নেই কেঁদে বলে দুঃখে।
আল্লাহ্র পথে চলার কথা শুনলে কারো মুখে
সময় আছে অনেক এখনও হেসে বলে সুখে।

এমনি ভাবে হচ্ছে শেষ- এই ধরণীর সংসার
হঠাৎ করেই এসে যাবে কবরের অন্ধকার।
কেমন করে দিবে জবাব ফেরেস্তার সওয়াল
ব্যর্থ হবে ইহজগৎ জ্বলতে হবে অসীম কাল।

অশেষ শান্তি পেতে হলে মানতে হবে কুরআন
অনুসরণ করতে হবে নবীর দেখানো বিধান।

কবিতাটি গান হতে চেয়েছিল

কৃষ্ণা মিত্র

কবিতাটি গান হতে চেয়েছিল,
নীল আকাশ যে ক্ষণে তাকে আনন্দে ভাসিয়ে ছিল
সেই তখন থেকেই সে ছিল অপেক্ষায়
কোন এক শরতের ভোরে শিউলির সুঘ্রাণ নিয়ে
আসবে তার প্রার্থিত অতিথি, শুধু তারই অপেক্ষাতে কেটে গেল শরৎ শীত
শীতের পরে এল বসন্ত, আবার নতুন স্বপ্ন বোনা-
আবির মাখা কোন এক বসন্ত সন্ধ্যায়,
অফুরন্ত সুর নিয়ে আসবে নাম না জানা অতিথি
তার শরীরের শব্দাবলী নিয়ে ক্লান্তিহীন রাত কাটাবে সুরকার।
স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারীতে সঞ্চারিত হবে সাত সুরের রংধনু
কবিতাটি প্রজাপতি হয়ে ডানায় ডানায় সুরের রং ছড়িয়ে উড়ে বেড়াবে।
চাওয়া-পাওয়ার মায়াজালে শুধু ছিল অপেক্ষা
আজ অসময় সায়াহ্নে কবিতাটি নিঃসীম ক্লান্তিতে শ্রান্ত...
এ কালের সুরকার সে কালের কবিতায় সুর খুঁজে পান না ॥

প্রয়োগ প্রয়োগ শুদ্ধ ভাষা   সুবলকুমার বণিক

পটভূমি অর্থে লেখো পরিপ্রেক্ষিত

‘পরি’ বাদ দিয়ে যদি
লেখ তুমি ‘প্রেক্ষিত’
পটভূমি বোঝাবে না
জেনো এটা নিশ্চিত।
লেখো **পরিপ্রেক্ষিত**
পটভূমি অর্থে
প্রেক্ষিত লিখে কেন
যাবে ভুল করতে ?

[মূল শব্দ ‘প্রেক্ষণ’– এটি বিশেষ্য, তা থেকেই বিশেষণপদ গঠিত হয়েছে ‘প্রেক্ষিত’। ‘প্রেক্ষণ’ অর্থ ‘দেখা’ আর ‘প্রেক্ষিত’ হচ্ছে, ‘যা প্রেক্ষণ বা দর্শন করা হয়েছে’। যে গৃহে বসে দর্শন করা হয়, সেটাই প্রেক্ষাগৃহ। আজকাল অনেকেই ‘পটভূমি’ বা ‘প্রেক্ষাপট’ অর্থে ‘প্রেক্ষিত’ শব্দটির ব্যবহার করছেন। কিন্তু এটি অশুদ্ধ প্রয়োগ। ‘পটভূমি’ বা ‘প্রেক্ষাপট’ অর্থে শুদ্ধ শব্দ হচ্ছে ‘পরিপ্রেক্ষিত’। ইংরেজিতে একেই বলে perspective বা background। সুতরাং ‘পটভূমি’ বা ‘প্রেক্ষাপট’ অর্থে ‘প্রেক্ষিত’ লিখবে না, লিখবে ‘পরিপ্রেক্ষিত’।]

প্রাপ্তি

নুরুন নাহার

ঔষধের বাক্সটা খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে গেছেন রাহেলা খাতুন। কাল রাতেই শোবার আগে শেষবার ঔষধ খেয়েছিলেন। তারপর আর কিছুতেই মনে করতে পারছেন না কোথায় রেখেছেন ওটা। ব্যাগট্যাগ গোছানো মোটামুটি শেষ। দুই মাসের জন্য যাচ্ছেন। এখন ঔষধের বাক্সটা পেলেই হয়। রাহেলা খাতুন বছর চারেক ধরে জামাই বাড়িতে আছেন। কর্তা মারা যাবার পর মেয়ে জামাই দুজনে মিলে ভাইদের কাছ থেকে একপ্রকার জোর করেই তাকে নিয়ে আসে গুলশানের প্রায় প্রাসাদোপম বাড়িতে। সেই তুলনায় ছেলেরা তার নেহায়েতই গরিব। পড়াশোনায় ছিল গড়পড়তা। বাবার মাঝারি গোছের মাস মাইনের চাকরিতে স্কুলের পড়ার জন্য ছেলেদের আলাদা করে অংক, ইংরেজির শিক্ষক দেয়া একেবারেই সম্ভব ছিল না। তার ওপর দুই ভাই হবার পর দীর্ঘ সাত বছরের বিরতিতে যখন মেয়েটি পরির মতো রূপ নিয়ে জন্মালো তখন বাবা-ভাই মিলে তিনজনের যেন আদিখ্যেতার সীমা রইল না। রূপের পাশাপাশি পড়াশোনায়ও মেয়েটি চৌকস হয়ে উঠলো- আর তার পাশে ভাই দুটি সাধারণ থেকে আরও সাধারণ হতে থাকল। মেয়ের খুব ভালো বিয়ে হলো। বাবা তার অবসরকালীন সব বেনিফিট মেয়ের বিয়েতে প্রাণ ভরে খরচ করলেন। ছেলে দুটির জন্য কিছুই থাকল না। সে মেয়ের একমাত্র ননদ থাকে আমেরিকায়। সেই আসছে কালকে তার পাঁচ ছেলেমেয়েসহ স্বামী নিয়ে। প্রতিবছরই আসে গরমের ছুটিতে। সাথে করে কুড়িখানা পেল্লাই স্যুটকেস সমেত। তাতে ফরমায়েশি ল্যাপটপ, মোবাইল ফোন থেকে শুরু করে ওয়াশরুম, বেডরুমের জিনিসপত্র সহ কিচেন কেবিনেটের তাকে গুঁড়ো আদা, রসুন, প্যানকেকের গুঁড়োর কৌটা মায় বাদাম চকলেটের পেস্ট পর্যন্ত গুচ্ছের মালামাল থাকে। আরো থাকে মহার্ঘ্য সেইসব শাড়ি ও পোশাক যা মেয়ে একসময় ননদের পাঠানো অগুনতি ডলারে ফরমায়েশ মতো এখান থেকে কিনে পাঠায়। কখনো বা ননদিনী খোদ আমেরিকায় নানাবিধ পোশাক কিনে দুই-একবার ব্যবহার করেই ব্যাগ বোঝাই করে নিয়ে আসে এমনটি ভেবে যে, ঐ পোশাক সবাই দেখে ফেলেছে, আর পরা যাবেনা অথবা নতুন কেনার অপেক্ষায় যেগুলো রয়েছে তাদের জায়গা করে দিতে। তবে মেয়ের ননদটি ভালো। সবার জন্যই মনে করে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। তার ছেলে বউয়েরাও বাদ যায় না। তবে মেয়ে জামাইও ননদ-বোনের জন্য প্রাণ ঢেলে করে। তাইতো মেয়ে ঠেস দিতে ছাড়ে না। বুঝলে মা, দোলন আর ওর বাচ্চাদের কপাল বটে। তোমার জামাই দেখ, বোন বোনজামাই আর তার বাচ্চাদের জন্য কীভাবে করে। আর আমার বাচ্চাদের কপাল দেখো- দু'দুটো মামা রয়েছে। অথচ ঈদে পরবে একটা সুতোও মেলেনা। রাহেলা খাতুন মেয়ের এহেন কথায় কষ্ট পান কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারেন না যে সাধ্যের ভিতরে তো ওরা চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেই উপহারে তো তোমার মন উঠেনি। সেই কাপড় পরে মেয়ের বাসার বুয়ার বাচ্চার গায়ে উঠেছে দেখে তিনি খুবই মর্মাহত হন।

এ বাড়ির নিয়মমতো সবাই পকেট মানি পায়- তিনিও পান। যতই না-না করুন জামাই বাবাজি শুনতে চাননা। তাই জমেছে বেশ কিছু - কেননা তারতো আর আলাদা কোনো খরচ নেই। তাই এদিয়েই ভাবছেন ওরা যেমনটি চায় তেমনটিই খরচ করবেন। ফি বছর মেয়ের ননদ আসে - তাকে কখনো ছেলেদের কাছে গিয়ে থাকতে হয়নি। এবার হচ্ছে - যদিও মেয়ে বলেছে-দোলনের ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে - ওদের বেশি স্পেস দরকার। কিন্তু রাহেলা খাতুন জানেন তাকে ছেলের বাড়িতে পাঠানোর কারণটা অন্য। ননদিনী ঢাকায় এসে ১০/১২ দিন থাকার পরই ভারত, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ঘুরতে যাবে সবাই মিলে। মাকে একা রেখে যাওয়াটা খারাপ দেখায় আবার সাথে করে নেওয়াও সম্ভব নয়। আসলে এতে লুকোছাপার কিছুইতো নেই। তিনি দিব্যি মেনে নিতেন। ছেলেদের অভাবের সংসারে নিজে বোঝা হতে চাননা বলে, আর এই বৃদ্ধ বয়সে অসহায় নিরুপায় অবস্থাটা তাকে খানিকটা স্বার্থপরও করে তুলেছে- শারীরিক নানা জটিলতায় মেয়ের কাছে ঠিকঠাক চিকিৎসা, ঔষধটা পান।

ঔষধের কৌটা খুঁজতে খুঁজতে কোন্ ভাবনায় নিমজ্জিত হয়েছেন রাহেলা খাতুন তার তল পাননা। সামনে দিয়েই যাচ্ছিল বড় নাতনি– সামান্থা। ওকে থামিয়েই জিজ্ঞেস করেন, আমার ঔষুধের বাক্সটা পাচ্ছিনা, বুবু সোনা, -দেখেছিস তুই ?

উম্- তুমি না কাল রাতে কিচেনে ঔষধের বাক্স হাতে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ - ঐ যে পানির বোতলটা শেষ হয়ে গিয়েছিল তো - তাই বাক্স হাতেই মনে হয় গিয়েছিলাম কিচেনে পানির জন্য।

হু, দাঁড়াও দেখছি। বলে সামান্থা খানিক বাদেই ঔষধ নিয়ে ফেরত আসে।

এই যে, পরিখালা মসলার তাকে তুলে রেখেছিল- এই নাও।

তোমার গোছানো শেষ ?

হ্যাঁ- এইতো মোটামুটি।

একটু দাঁড়াও বলেই আবার ঝড়ের বেগে ছুটে যায় সামান্থা। ফিরে আসে একটা ছোট মানিব্যাগ হাতে নিয়ে।

এটা রাখো।

কি এটা ?

আমার পকেট মানির টাকা। খরচ করারতো দরকারই হয়না- জমেছে সব টাকা।

রাহেলা বেগম ব্যাগের মুখটি খুলে দেখেন অনেকগুলো পাঁচশ টাকার নোট। হাজার বিশেকতো হবেই। তিনি দ্রুত নাতনির হাতে ফেরত দিয়ে দেন- না না, এর কোনো দরকার নেই।

দরকার আছে- এটা সম্পূর্ণ আমার টাকা। কারও কিছু বলার নেই। তুমি এই দুই মাস বাপ্পা, তোতোন, রিমি, রিনিদের নিয়ে অনেক মজা করবে। ছটফটে মেয়েটা নানুর হাতে জোর করে মানিব্যাগ গুঁজে দিয়ে দ্রুত আর একদিকে চলে যায়।

আর রাহেলা বেগমের দু'চোখ ভিজে যায় জলে- বুকের গহীনে আত্মজার তৈরি শূন্যতাটি ভরিয়ে দেয় তারই আত্মজা- এ এক মধুর প্রাপ্তি- অর্থমূল্যে যা কখনো মাপা যাবে না।

■ *লেখক : ডিজিএম, এফইআইডি, প্রধান কার্যালয়*

Function Key এর Function জেনে নিন
F1 থেকে F12

মোঃইকরামুল কবীর

কম্পিউটার যারা ব্যবহার করি তাদের কেউ যদি না জানেন তাদের জন্য। কম্পিউটারের Keyboard এর ওপরের দিকে F1 থেকে F12 পর্যন্ত যে এক ডজন Key আছে সেগুলোকে বলা হয় Function Key। এসব Key একবার চেপেই বিভিন্ন সফটওয়্যারে নানা রকম কাজ করা যায়। আজ আমি আপনাদের বলব এই সব Key এর কাজ কি কি। এগুলো কোন্ কোন্ কাজ করে থাকে। আমরা হয়তো অনেকেই জানি। তাও আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া আর কি।

F1: সহায়তাকারী Key হিসেবে ব্যবহৃত হয়। F1 চাপলে প্রতিটি প্রোগ্রামের 'হেল্প' চলে আসে।

F2: সাধারণত কোন ফাইল বা ফোল্ডারের নাম বদলের (Rename) জন্য ব্যবহৃত হয়। Alt+Ctrl+F2 চেপে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের নতুন ফাইল খোলা হয়। Ctrl+F2 চেপে ওয়ার্ডে প্রিন্ট প্রিভিউ দেখা যায়।

F3: এটি চাপলে মাইক্রোসফট উইন্ডোজসহ অনেক প্রোগ্রামের সার্চ সুবিধা চালু হয়। Shift+F3 চেপে ওয়ার্ডের লেখা বড় হাতের থেকে ছোট হাতের বা প্রত্যেক শব্দের প্রথম অক্ষর বড় হাতের বর্ণ দিয়ে শুরু ইত্যাদি কাজ করা হয়।

F4: ওয়ার্ডের last action performed আবার (Repeat) করা যায় এ Key চেপে। Alt+F4 চেপে সক্রিয় সব প্রোগ্রাম বন্ধকরা হয়। Ctrl+F4 চেপে সক্রিয় সব উইন্ডো বন্ধকরা হয়।

F5: মাইক্রোসফট উইন্ডোজ, ইন্টারনেট ব্রাউজার ইত্যাদি Refresh করা হয় F5 চেপে। পাওয়ার পয়েন্টের স্লাইড শো শুরু করা যায়। ওয়ার্ডের find, replace, go to উইন্ডো খোলা হয়।

F6: এটা দিয়ে মাউস কার্সরকে ওয়েব ব্রাউজারের ঠিকানা লেখার জায়গায় (Address bar)নিয়ে যাওয়া হয়। Ctrl+Shift+F6 চেপে ওয়ার্ডে খোলা অন্য ডকুমেন্টটি সক্রিয় করা হয়।

F7: ওয়ার্ডে লেখার বানান ও ব্যাকরণ ঠিক করা হয় এ key চেপে। ফায়ারফক্সে Caret browsing চালু করা যায়। Shift+F7 চেপে ওয়ার্ডে কোন নির্বাচিত শব্দের প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ, শব্দের ধরণ ইত্যাদি জানার অভিধান চালু করা হয়।

F8: অপারেটিং সিস্টেম চালু হওয়ার সময় কাজে লাগে এই Key। সাধারণত উইন্ডোজ Safe Mode-এ চালাতে এটি চাপতে হয়।

F9: কোয়ার্ক এক্সপ্রেস ৫০-এর মেজারমেন্ট টুলবার খোলা যায় এই Key দিয়ে।

F10: ওয়েব ব্রাউজার বা কোন খোলা উইন্ডোর মেনুবার নির্বাচন করা হয় এ Key চেপে। Shift+F10 চেপে কোন নির্বাচিত লেখা বা সংযুক্তি, লিংক বা ছবির ওপর মাউস রেখে ডান বাটনে ক্লিক করার কাজ করা হয়।

F11: ওয়েব ব্রাউজার পর্দাজুড়ে দেখা যায়।

F12: ওয়ার্ডের Save as উইন্ডো খোলা হয় এ Key চেপে। Shift +F12 চেপে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইল সেভ করা হয়। এবং Ctrl+Shift+F12 চেপে ওয়ার্ডে ফাইল প্রিন্ট করা হয়।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি)
আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট
ই-মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

নেট বিনোদন

বোঝার ওপর শাকের আঁটি

রোদ আর বৃষ্টি, এ কি অনাসৃষ্টি

গাধায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল কিছু দূর যাইয়া মর্দ ফেসবুক খুলিল

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ রাফিউল আলম (রাফি)
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা:রাবেয়া বাসরী
(এডি, ইএমডি, প্রকা)
পিতা:খায়রুল আলম
(ডিডি, ইডি-৮ শাখা, প্রকা)

রিফা তাসফিয়া (রাত্রি)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা:সুলতানা বেগম
পিতা:খায়রুল ইসলাম খন্দকার
(ডিডি, ডেপুটি গভর্নর-৩ শাখা, প্রকা)

ধ্রুব সমদ্দার (জয়)
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা:মিতু সমদ্দার
পিতা:হিরালাল মজুমদার
(অফিসার, বাংলাদেশ ব্যাংক কো-অপারেটিভ, ঢাকা)

মোঃ নাজমুস্ সাকিব (নাফিজ)
গভঃ ল্যাবরেটরী হাই স্কুল, ধানমণ্ডি

মাতা:মরহুমা নাজনীন আরা বেগম
পিতা:মোঃমোয়াজ্জেম হোসেন
(ডিডি, এএন্ডবিডি, প্রকা)

তাসমীমা হক কথা
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা:হালিমা হক
পিত:মোঃআনোয়ারুল হক
(ডিএম (ক্যাশ) মতিঝিল অফিস)

উলফাত রায়হানা রিচি
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ

মাতা:আকলিমা পারভীন
পিতা:এবিএম রায়হানুল ইসলাম
(ডিডি, ডিওএস, প্রকা)

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

ফারিয়া মেহজাবিন (এষা)
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মাতা:ফজিলাতুন নেছা
পিতা:মোঃআব্দুল মতিন
(ডিডি, আইটিওসিডি, প্রকা)

তামিম তাইয়্যেবা
মণিপুর হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর

মাতা:শাহিদা আখতার মোমিন
(এএম (ক্যাশ) মতিঝিল অফিস)
পিতা:মোঃবেলাল হোসেন

তাকরীমা হাসান
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা:ইসরাত জাহান
পিতা:মোঃশাহরিয়ার হাসান
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্রকা)

জিনাত আরা জেরিন
বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল

মাতা:আফরুজা বেগম
পিতা:মোঃজাহেদুল ইসলাম
(জেডি, পরিসংখ্যান বিভাগ, প্রকা)

সাদিয়া শারমিন রহমান (লাবীবা)
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

মাতা: মোসাম্মৎ আফরোজা পারভীন
পিতা:মোঃআনিচুর রহমান
(জেডি, সিআইবি, প্রকা)

মোঃ নায়িম হাসান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বনশ্রী

মাতা:সীমা আক্তার
পিতা:মোঃনাজমুল হাসান
(ডিডি, বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগ, প্রকা)

আনিকা নাওয়ার
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ

মাতা:শামিমা সুলতানা
পিতা:মোঃআব্দুল হাকিম
(ডিজিএম, কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ, প্রকা)

২০১৩ সালে এইচএসসিতে জিপিএ-৫

মোঃ সানোয়ার হোসেন (মুন্না)
রাজশাহী কলেজ (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:শামীমা বানু
(ডিএম, ক্যাশ বিভাগ)
পিতা:মোঃগোলাম মোস্তফা
(ডিডি, রংপুর অফিস)

পাপিয়া বিশ্বাস (মনি)
সরকারি হাজী মুহাম্মদ মহসিন কলেজ, চট্টগ্রাম (বিজ্ঞান বিভাগ)

মাতা:প্রীতি বিশ্বাস
পিতা:সুবোধ রঞ্জন বিশ্বাস
(জেডি, চট্টগ্রাম অফিস)

জোহরা বেগম হিরা
সরকারি কমার্স কলেজ, চট্টগ্রাম (বাণিজ্য বিভাগ)

মাতা:সাবেরা বেগম
পিতা:মোঃআবদুল কাদের
(সিনিঃকেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম অফিস)

ইশিকা আহমেদ
সাউথ ব্রীজ স্কুল (ও লেভেল- ২০১৩)

মাতা:আসমত আরা আহমেদ
পিতা:এম, ফরদুল আহমেদ
(জেডি, এফআরটিএমডি, প্রকা)

প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন

অন্তিম দত্ত চট্টগ্রাম অঞ্চল হতে ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। সে বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের এএম (ক্যাশ) শ্যামল দত্তএবং শান্তি রানী দেবীর পুত্র।

কিশোর অর্থনীতি

মুদ্রার ধারণা

বাংলাদেশে প্রথম ধাতব মুদ্রা

বাংলাদেশে প্রথম ধাতুর মুদ্রা চালু করেন খলজিবংশের আরেক রাজা গিয়াসউদ্দিন ইওয়ায় খলজি। তিনি ১২১৩ সালে রাজা হন এবং ১২২৭ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। তাঁর প্রচলিত মুদ্রা থেকে বোঝা যায়, বাগদাদের খলিফার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। পরবর্তী সময়ে বাংলায় আরও অনেক রাজা বা সুলতানই নিজেদের মুদ্রা চালু করেছিলেন।

খলজিবংশের শাসনামলেও চিনদেশ থেকে পর্যটকরা বাংলাদেশ ভ্রমণে আসেন। একদল পর্যটক বাংলাদেশে ভ্রমণ করে চিনদেশে ফিরে গিয়ে তখনকার সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখেন। তাঁদের লেখা ভ্রমণকাহিনি থেকে তখনকার বাংলাদেশ সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। এ সময় বাংলাদেশে রুপার টাকা চালু ছিল। এ রুপার টাকাকেও বলা হতো তঙ্কা। তখন ছোট লেনদেনের জন্য কড়ি ব্যবহৃত হলেও বড় লেনদেনের জন্য তঙ্কা ব্যবহার করা হতো। কড়ি ছিল একেবারেই খুচরা পয়সার মতো। এর দামও ছিল খুব কম।

প্রায় ৬০০ বছর আগে বাংলাদেশে রুপার টাকা বা তঙ্কার চলনই বেশি ছিল। তবে স্বর্ণমুদ্রা যে একেবারেই ছিল না তা নয়। গবেষকরা এ সময়ের আট প্রকারের মুদ্রা পেয়েছেন। এগুলো ছিল মানুষের আদরের ধন। সহজে কেউ স্বর্ণমুদ্রা খরচ করতে চাইত না। এখনও মানুষ বাজারে গিয়ে যেমন নতুন চকচকে টাকাটা রেখে পুরনো টাকাটাই আগে খরচ করে, ঠিক তেমনি।

বাংলাদেশে তখন জিনিসপত্রের দাম ছিল খুবই কম। তা ছাড়া আজকের মতো টেলিভিশন, ফ্রিজ, গাড়ি বা দামি খেলনা ছিল না। সাধারণ যেসব জিনিস বাজারে পাওয়া যেত সেগুলো কড়ি দিয়েই কেনা যেত। কেবল জমির মতো দামি জিনিস কিনতেই তঙ্কার দরকার হতো। সে জন্য স্বর্ণমুদ্রার মতো দামি জিনিস আসলে কোনো কাজেই লাগত না। কথাটা মনে হয় ঠিক হলো না, স্বর্ণমুদ্রা ছিল শখ করে জমিয়ে রাখার জিনিস। যার কাছে স্বর্ণমুদ্রা থাকত তার সামাজিক মান বাড়ত। আবার কোনো রাজা যখন অন্যদেশ দখল করতেন বা কোনো যুদ্ধে জয় লাভ করতেন তখন এ উপলক্ষে তিনি স্বর্ণমুদ্রা বাজারে ছাড়তেন। আসলে এই জয়ের ঘটনাটাকে তিনি স্মরণীয় করে রাখার জন্যই এটি করতেন, বাজারে স্বর্ণমুদ্রার চাহিদার জন্য নয়। এ ধরনের মুদ্রাকে বলা হয় স্মারক মুদ্রা বা সুভেনির। এখনও কোনো বিশেষ দিনে সরকার স্মারক মুদ্রা ও ডাকটিকেট বাজারে ছাড়েন।

ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি বাংলাদেশ শাসন করত কররানি বংশের রাজারা। তখন দিল্লির শাসক ছিলেন মোগলবংশের সম্রাটগণ। সম্রাট আকবর ছিলেন খুবই ক্ষমতাবান রাজা। তাঁকে ছোট ছোট রাজারা সমীহ করে চলতেন। সম্রাট আকবরকে তাঁরা কর বা উপঢৌকন দিতেন। বাংলার রাজা সুলেমান কররানিও সম্রাট আকবরকে সম্মান করে চলতেন। কিন্তু সুলেমানের পুত্র দাউদ কররানি সিংহাসনে বসেই আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। তিনি আকবরের অধীনতা মানতে চাইলেন না। তখন আকবরের সৈন্যদের সঙ্গে দাউদ কররানির যুদ্ধ হলো। সে যুদ্ধে দাউদ পরাজিত ও নিহত হলেন। বাংলাদেশ চলে গেল দিল্লির সম্রাট আকবরের অধীনে।

মোগলদের অধীনতা

মোগল সম্রাটগণ এ সময় প্রায় পৌনে ২০০ বছর ধরে বাংলাদেশ শাসন করলেন। তাই বাংলাদেশ থেকে পুরোনো আমলের সব টাকাই উঠে যায়। তার বদলে দিল্লির মোগল সম্রাটদের চালু করা টাকাই বাংলাদেশে চালু হয়। মোগলদের তৈরি রুপার টাকার নাম ছিল রুপেয়া। আর স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল মোহর। প্রাচীন রূপকথাগুলোতে রাজাদের মোহর লেনদেনের কথা জানা যায়। একজন দরিদ্র সংগীতশিল্পীর গান শুনে রাজা মুগ্ধ হয়ে তাকে ১০০ মোহর উপহার দিলেন। দরিদ্র শিল্পী এক মুহূর্তেই ধনী হয়ে গেল।

আবার আরেক গরিব জেলে নদীতে জাল ফেলে আশ্চর্য এক কলসি পেয়েছিল। সেই কলসিতে আংটির ঘষা লাগতেই ধোঁয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে বেরিয়ে এসেছিল প্রকাণ্ড এক দৈত্য। দৈত্য গমগম করে আকাশকাঁপানো শব্দে বলেছিল, 'আমি আপনার গোলাম, জনাব। আমার কাছে কী চান, বলুন।'

দৈত্যকে দেখে জেলে তো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অস্থির। তবু সাহস করে বলল, 'আমাকে ধনী বানিয়ে দাও।'

সঙ্গেসঙ্গে দৈত্য ডুব দিল সাগরের তলায়। কিছুক্ষণ পর সে নিয়ে এল ১০৫টি পিতলের কলসি। মোহর আর মোহরে কলসিগুলো ভর্তি। মোগল আমলে মোহর আর রুপেয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশে কড়িও চালু ছিল। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় কড়ি দিয়ে লেনদেন হয়েছে বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ তখন শাসন করছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। এ সময় একটি ইংরেজ কোম্পানি ভারতবর্ষে ব্যবসা করত। কোম্পানিটির নাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। সুচতুর ইংরেজ কোম্পানিটি গোপনে দেশ দখলের চেষ্টা চালাতে থাকে। কেবল ব্যবসা করেই তাদের মন ভরে না। তারা নানাভাবে নবাবের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। অবশেষে ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সৈন্যদের যুদ্ধ হয়। পলাশি নামক স্থানে এ যুদ্ধে ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। বাংলাদেশ তখন ইংরেজদের অধীনে চলে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিই হয়ে যায় বাংলাদেশের শাসক।

তখনও দিল্লির শাসক ছিলেন মোগলবংশের শাসকরা। তবে তাঁরা মূলত ছিলেন পুতুলনাচের পুতুলের মতো। পুতুলনাচের বোষ্টমি যখন বোষ্টমকে নিয়ে নাচে আর গান গায় তখন সে নিজে কিন্তু কিছুই করে না। আসলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে একজন পুতুলটি নাচায়। পুতুলের গায়ে যে সুতো বাঁধা থাকে তারই আরেকদিক বাঁধা থাকে ওই লোকটির আঙুলে। লোকটির আঙুল যেভাবে নড়ে, পুতুলও সেভাবেই নড়ে। ঠিক এভাবেই মোগল শাসকরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পুতুলনাচের সুতোয় বাঁধা পড়ে। সিংহাসনে বসে শেষ দিকের মোগল সম্রাটরা ইংরেজের সুতোর টানে কেবলই নাচতে থাকে।

এ সময় দিল্লির মোগল সম্রাটদের চালু করা মুদ্রাই বাংলাদেশে চলতে থাকে। তবে মুদ্রার গায়ে ব্যবহৃত হতে থাকে ইংরেজদের পছন্দ করা

প্রতীক।

বাংলাদেশ দখলের ১০০ বছর পর, অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষের সৈন্যরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। ইতিহাসে এটাকে বলা হয় 'সিপাহি বিদ্রোহ'। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ঢাকার সদরঘাট এলাকার বাহাদুর শাহ পার্কে আজও এ বিদ্রোহের স্মৃতিসৌধ দাঁড়িয়ে আছে।

সিপাহি বিদ্রোহে এ দেশের সৈন্যরা বিজয়ী না হলেও ইংরেজ শাসনের ভিত কেঁপে যায়। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে তাদের অধীন রাখার জন্য নতুন করে শাসনব্যবস্থা সাজায়। তারা দিল্লি থেকে মোগল সম্রাটকে অপসারণ করে। সেইসঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে শাসনক্ষমতা নিয়ে নেয়। পুরো ভারতবর্ষ চলে যায় ইংল্যান্ডের মহারানি ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীনে।

ইংরেজ শাসনামলেও রুপেয়া ও মোহর বাজারে চালু থাকে। তবে মুদ্রার গায়ে ধর্মীয় বাণী লেখার বদলে এবার ইংল্যান্ডের রাজারানির ছবি খোদাই করা শুরু হয়।

ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে বেরিয়ে আসছে প্রকাণ্ড দৈত্য

পরের ৯০ বছর ধরে ভারতবর্ষে একটানা চলে ইংরেজ শাসন। পাশাপাশি দেশের স্বাধীনতার আন্দোলনও চলতে থাকে। বাংলাদেশসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন-সংগ্রামে বহু মানুষ প্রাণ দেয়। হাজার হাজার দেশপ্রেমিকের রক্তে ভিজে ওঠে এ দেশের মাটি।

অবশেষে ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ১৪ আগস্ট স্বাধীন হয় পাকিস্তান, আর ১৫ আগস্ট ভারত।

বাংলাদেশ বা পূর্ব পাকিস্তানে তখন চালু হয় পাকিস্তানি মুদ্রা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব মুদ্রা চালু ও নিয়ন্ত্রণ করে।

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার কিছুদিন পরই বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে পারল যে, প্রকৃত স্বাধীনতা তারা পায়নি। বাংলাদেশ আগে ছিল ইংরেজদের অধীন, এখন হলো পাকিস্তানের অধীন। আবার শুরু হলো সংগ্রাম-আন্দোলন। প্রায় ২৪ বছর পাকিস্তানের অধীন থাকার পর ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। শুরু হয় মুক্তির চূড়ান্ত লড়াই। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ বিজয় লাভ করে। বাংলাদেশে পাকিস্তানি শাসনের অবসান ঘটে।

স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ তার নিজস্ব মুদ্রা চালু করে। এই মুদ্রা চালু ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

তথ্য ও উপাত্ত

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

২০ জানুয়ারি ২০১৩ : ১২৭৬৫.০৪
২০ জানুয়ারি ২০১৪ : ১৭৭২১.২৯

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ডিসেম্বর ২০১২ : ২৪৬৬.১৬
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২-১৩ : ১২৫৯৯.৭৩
ডিসেম্বর ২০১৩ : ২৭২৬.২০
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩-১৪ : ১৪৬৮৫.৮১

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ডিসেম্বর ২০১২ : ১২৮৭.৩১
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১২-১৩ : ৭৪০১.৭৮
ডিসেম্বর ২০১৩ : ১২১৬.৪৯
জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৩-১৪ : ৬৭৭৮.৫৭

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

নভেম্বর ২০১২ : ২৭৪১.৭৪
জুলাই-নভেম্বর ২০১২-১৩ : ১৪২০০.১৬
নভেম্বর ২০১৩ : ২৯৭৭.০২
জুলাই-নভেম্বর ২০১৩-১৪ : ১৫৪৫৫.৪৬

ব্রড মানি (M_2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৫০৭.৫১
নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৬৪২৫.৭৬

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ১০৬১.৫৪
নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ১২০৫.৬৫

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৫৩৯১.৪৩
নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৯৭২.৪৬

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত : ৪২৪৮.১৮
নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৭২০.৮৬

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.২২
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.১৪
ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৫৩
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৩৫

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

শিশিরভেজা শীতের ফুল

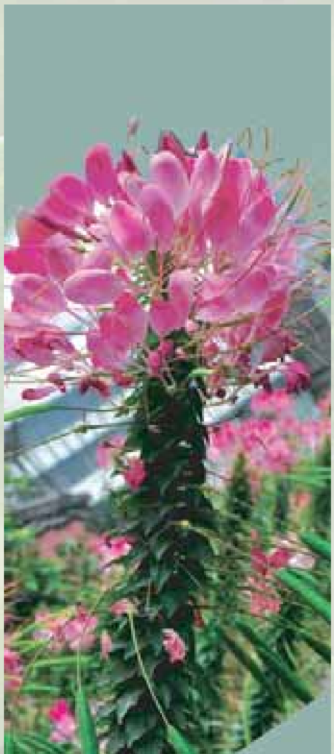

ষড় ঋতুর দেশ বাংলাদেশ। সোনাফলা এ দেশে একেক ঋতুতে ফোটে ভিন্ন ভিন্ন রঙের ভিন্ন ভিন্ন ফুল। ফুলের রঙের পরিবর্তনের সাথে ঋতুর পরিবর্তনও আমরা অনুভব করতে পারি। মনের চোখ দিয়ে দেখলে সে অনুভবের অভিজ্ঞতা হয় সুখকর ও রোমাঞ্চকর। আর শীতের সময়ের অনুভূতি অন্য সময় থেকে অনেকটাই আলাদা। শীত মরসুমি ফুলের ঋতু, নানা রঙের নানা ফুলের সমাহার আমাদের মনকে ঝলমলে ও উজ্জ্বল করে তোলে। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের বাগানগুলোতে নানা রকম মরসুমি ফুলের কেয়ারি তৈরি করা হয়। কেয়ারিতে জিনিয়া, সূর্যমুখী, ডালিয়া, কসমস, পিটুনিয়া, গাঁদা, লুপিন, চন্দ্রমল্লিকার সমারোহ দেখা যায়। শীতের সময় বাগানগুলো সাজে নানা রঙে নানা বর্ণে। ঠাণ্ডা আর শুষ্ক পরিবেশে বাংলাদেশ ব্যাংকের বাগানে ঠিকই নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে এ বিদেশি ফুলগুলো।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ ফুল ভালোবাসে, ফুলের সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ। অন্য ঋতুর চেয়ে শীতকালে অনেক বেশি ফুল ফোটে। এর মধ্যে দেশি-বিদেশি গোলাপ, জিনিয়া, গাঁদা, মোরগফুল সহ বাহারি নানা ফুল। ইউরোপিয় এনিটরিনাম, দক্ষিণ আফ্রিকার ডেইজি, ফ্রান্সের মেরিগোল্ড ও কারনেশন প্যানজি, মেক্সিকোর ডালিয়া ন্যাস্টারশিয়াম, চিনের অ্যাস্টার, জাপানের চন্দ্রমল্লিকা, যুক্তরাষ্ট্রের ক্লার্কিয়া পপি ও লুপিন, সিসিলির সুইটপি প্রভৃতি ফুলের গাছ এখন আমাদের দেশে সুলভ।

বাংলাদেশে শীতের জনপ্রিয় ফুল হচ্ছে গাঢ় সবুজ চিরল পাতার হলুদ ফুল গাঁদা। রঙের বৈচিত্র্য আর সহজে জন্মায় বলে বাগান তৈরিতে এই ফুলের কদর বেশি। একসঙ্গে অনেক ফুলে পুরো বাগান যেন হলুদ রঙে সেজে ওঠে, হালকা গন্ধও আছে। হলুদ ছাড়াও কমলা ও খয়েরি গাঁদা দেখা যায়।

ফুলের প্রতি আকর্ষণ মানুষের অন্তর্গত তাগিদের বহিঃপ্রকাশ। আর এ নান্দনিক চাহিদা পূরণের এক অতি সুন্দর উপকরণ হলো ফুল। ফুলের বাগান স্থাপন, গৃহের এক কোণে ফুল গাছ রোপণ, টবে বা ঝুলন্ত মাটির পাত্রে ফুলের গাছ লাগানোর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের যান্ত্রিক জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরিয়ে আনতে পারি।

এই শীতে নিজ হাতে ফুল ফুটিয়ে আপনিও পেতে পারেন এ স্বর্গীয় অনুভূতি, একটু আনন্দ। এ শীতে কিছু ফুল যদি আপনার বাগানে বা করিডোরে না ফোটে তবে শীতকালটা একেবারেই পানসে মনে হতে পারে। তাই আজই আপনার বাগান, বারান্দা কিংবা করিডোর সাজিয়ে ফেলুন বাহারি রঙের শীতের ফুল গাছ দিয়ে। রোদ ও শিশিরের আলতো ছোঁয়ায় নতুন রূপে হেসে উঠুক শীতের ফুল। পরিবেশ-প্রকৃতিকে প্রাণবন্ত করে রাখতে জুড়ি নেই মৌসুমি ফুলের, শীত হয়ে উঠুক ফুলে ফুলে আনন্দময়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।